priyoboi.blogspot.com

একশৃঙ্গ অভিযান

১লা জুলাই

আশ্চর্য খবর। তিব্বত পর্যটক চার্লস উইলার্ডের একটা ডায়রি পাওয়া গেছে। মাত্র এক বছর আগে এই ইংরাজ পর্যটক তিব্বত থেকে ফেরার পথে সেখানকার কোনও অঞ্চলে খাম্‌পা শ্রেণীর এক দস্যুদলের হাতে পড়ে। দস্যুরা তার অধিকাংশ জিনিস লুট করে নিয়ে তাকে জখম করে রেখে চলে যায়। উইলার্ড কোনও রকমে প্রায় আধমরা অবস্থায় ভারতবর্ষের আলমোড়া শহরে এসে পৌঁছায়। সেইখানেই তার মৃত্যু হয়। এসব খবর আমি খবরের কাগজেই পড়েছিলাম। আজ লন্ডন থেকে আমার বন্ধু ভূতত্ত্ববিদ জেরেমি সন্ডার্সের একটা চিঠিতে জানলাম যে উইলার্ডের মৃত্যুর পর তার সামান্য জিনিসপত্রের মধ্যে একটা ডায়রি পাওয়া যায়, এবং সেটা এখন সন্ডার্সের হাতে। তাতে নাকি এক আশ্চর্য ব্যাপারের উল্লেখ আছে। আমার তিব্বত সম্বন্ধে প্রচণ্ড কৌতূহল, আর আমি তিব্বতি ভাষা জানি জেনে সন্ডার্স আমাকে চিঠিটা লিখেছে। সেটার একটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

> '...উইলার্ড আমার অনেক দিনের বন্ধু ছিল সেটা তুমি জান কি না জানি না। তার বিধবা স্ত্রী এডউইনার সঙ্গে পরশু দেখা করতে গিয়েছিলাম। সে বলল আলমোড়া থেকে তার মৃত স্বামীর যেসব জিনিস পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে একটা ডায়রি রয়েছে। সে ডায়রি আমি তার কাছ থেকে চেয়ে আনি। দুঃখের বিষয় ডায়রির অনেক লেখাই জল লেগে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই পড়া মুশকিল। কিন্তু তার শেষ পৃষ্ঠার কয়েকটা লাইন পড়তে কোনও অসুবিধা হয়নি। ১৯শে মার্চের একটা ঘটনা তাতে লেখা রয়েছে। শুধু দুটি লাইন—'আই স এ হার্ড অফ ইউনিকর্নস টু ডে। আই রাইট দিস্ ইন ফুল্ পোজেশন অফ মাই সেন্‌সেস।' তার পরেই একটা প্রচণ্ড ঝড়ের ইঙ্গিত পেয়ে উইলার্ড ডায়রি লেখা বন্ধ করে। তার এই অদ্ভুত উক্তি সম্বন্ধে তোমার কী মত জানতে ইচ্ছে করে'—ইত্যাদি।

উইলার্ড একপাল ইউনিকর্ন দেখেছে বলে লিখেছে। আর তার পরেই বলছে সেটা সে সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে দেখেছে। এটা বলার দরকার ছিল এই জন্যেই যে ইউনিকর্ন নামক প্রাণীটিকে আবহমানকাল থেকেই সারা বিশ্বের লোকে কাল্পনিক প্রাণী বলেই জানে। একশৃঙ্গ জানোয়ার। কপাল থেকে বেরোনো লম্বা প্যাঁচানো শিং বিশিষ্ট ঘোড়া। ইউনিকর্নের চেহারা বিলাতি আঁকা ছবিতে যা দেখা যায় তা হল এই। যেমন চিনের ড্রাগন কাল্পনিক, তেমনি ইউনিকর্নও কাল্পনিক।

কিন্তু এই কাল্পনিক কথাটা লিখতে গিয়েও আমার মনে খটকা লাগছে। আমার সামনে টেবিলের উপর একটা বই খোলা রয়েছে, সেটা মহেঞ্জোদাড়ো সম্পর্কে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই মহেঞ্জোদাড়োর মাটি খুঁড়ে আজ থেকে চার হাজার বছর আগেকার এক আশ্চর্য ভারতীয়

priyobanglaboi.blogspot.com

সভ্যতার যে সব নমুনা পেয়েছিলেন তারমধ্যে ঘর বাড়ি রাস্তা ঘাট হাঁড়ি কলসি খেলনা ইত্যাদি ছাড়াও এক জাতের জিনিস ছিল, যেগুলো হচ্ছে মাটির আর হাতির দাঁতের তৈরি চারকোনা সিল। এই সব সিলে খোদাই করা হাতি বাঘ ষাঁড় গণ্ডার ইত্যাদি আমাদের চেনা জানোয়ার ছাড়াও একরকম জানোয়ার দেখা যায়, যার শরীরটা অনেকটা বলদের মতো, কিন্তু মাথায় রয়েছে একটিমাত্র পাকানো শিং। এটাকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কাল্পনিক জানোয়ার বলেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু এতগুলো আসল জানোয়ারের পাশে হঠাৎ একটা আজগুবি জানোয়ার কেন খোদাই করা হবে সেটা আমি বুঝতে পারি না।

এ জানোয়ার যে কাল্পনিক নয় সেটা ভাবার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে দুহাজার বছর আগের রোমান পণ্ডিত প্লিনি তাঁর বিখ্যাত জীবতত্ত্বের বইয়েতে স্পষ্ট বলে গেছেন যে, ভারতবর্ষে একরকম গোরু আর একরকম গাধা পাওয়া যায় যাদের মাথায় মাত্র একটা শিং। গ্রিক মনীষী অ্যারিস্টটলও ভারতবর্ষে ইউনিকর্ন আছে বলে লিখে গেছেন। এ থেকে কি এমন ভাবা অন্যায় হবে যে, এককালে এদেশে এক ধরনের একশৃঙ্গ জানোয়ার ছিল যেটা এখান থেকে লোপ পেলেও, হয়তো তিব্বতের কোনও অজ্ঞাত অঞ্চলে রয়ে গেছে, আর উইলার্ড ঘটনাচক্রে সেই অঞ্চলে গিয়ে পড়ে এই জানোয়ার দেখতে পেয়েছেন? এ কথা ঠিক যে গত দুশো বছরে অনেক বিদেশি পর্যটকই তিব্বত গিয়ে তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন, এবং কেউই ইউনিকর্নের কথা লেখেননি। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হল? তিব্বতে এখনও অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষের পা পড়েনি। সুতরাং সে দেশের কোথায় যে কী আছে তা কি কেউ সঠিক বলতে পারে?

সন্ডার্সকে আমার এই কথাগুলো লিখে জানাব। দেখি ও কী বলে।

১৫ই জুলাই

আমার চিঠির উত্তরে লেখা সন্ডার্সের চিঠিটা তুলে দিচ্ছি—

প্রিয় শঙ্কু,

তোমার চিঠি পেলাম। উইলার্ডের ডায়রির শেষ দিকের খানিকটা অংশ পড়তে

পেরে আরও বিস্মিত হয়েছি। ১৬ই মার্চ সে লিখছে, 'টুডে আই ফ্লু উইথ দ্য টু হান্ড্রেড ইয়ার ওল্ড লামা।' ফ্লু মানে কি এরোপ্লেনে ওড়া? মনে তো হয় না। তিব্বতে রেলগাড়িই নেই, এরোপ্লেন যাবে কী করে। কিন্তু তা হলে কি সে কোনও যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই আকাশে ওড়ার কথা বলছে? তাই বা বিশ্বাস করি কী করে? এসব কথা পড়ে উইলার্ডের মাথা ঠিক ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে। অথচ আলমোড়ার যে ডাক্তারটি তাকে শেষ অবস্থায় দেখেছিলেন (মেজর হর্টন) তাঁর মতে উইলার্ডের মাথায় গণ্ডগোল ছিল না। ১৩ই মার্চের ডায়রিতে থোকচুম গোম্ফা নামে একটা মঠের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। উইলার্ডের মতে—'এ ওয়ান্ডারফুল মনাস্ট্রি। নো ইউরোপিয়ান হ্যাজ এভার বিন হিয়ার বিফোর।' তুমি কি এই মঠের নাম শুনেছ কখনও?...যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে—উইলার্ডের এই ডায়রি পড়ে আমার মনে তিব্বত যাবার একটা প্রবল বাসনা জেগেছে। আমার জার্মান বন্ধু উইলহেল্‌ম ক্রোলও এ ব্যাপারে উৎসাহী। তাকে অবিশ্যি উড়ন্ত লামার বিবরণই বেশি আকর্ষণ করেছে। জাদুবিদ্যা, উইচক্রাফ্‌ট ইত্যাদি সম্পর্কে ক্রোলের মূল্যবান গবেষণা আছে, তুমি হয়তো জান। সে পাহাড়েও চড়তে পারে খুব ভাল। বলা বাহুল্য, আমরা যদি যাই তো তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে খুবই ভাল হবে। এ মাসেই রওনা হওয়া যেতে পারে। কী স্থির কর সেটা আমাকে জানিও। শুভেচ্ছা নিও। ইতি

জেরেমি সন্ডার্স

উড়ন্ত লামা! তিব্বতি যোগী মিরারেপার আত্মজীবনী আমি পড়েছি। ইনি তান্ত্রিক জাদুবিদ্যা শিখে এবং যোগসাধনা করে নানারকম আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। তারমধ্যে একটা ছিল উড়ে বেড়াবার ক্ষমতা। এই জাতীয় কোনও মহাযোগীর সাহায্যেই কি উইলার্ড আকাশে উড়েছিলেন?

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আমারও মনে প্রচণ্ড কৌতূহল উদ্রেক করেছে। তিব্বত যাইনি; কেবল দেশটা নিয়ে ঘরে বসে পড়াশুনা করেছি, আর তিব্বতি ভাষাটা শিখেছি। ভাবছি সন্ডার্সের দলে আমিও যোগ দেব। এতে ওদের সুবিধাই হবে, কারণ আমার তৈরি এমন সব ওষুধপত্র আছে যার সাহায্যে পার্বত্য অভিযানের শারীরিক গ্লানি অনেকটা কমিয়ে দেওয়া যায়।

২৭শে জুলাই

আজ আমার পড়শি ও বন্ধু অবিনাশবাবুকে তিব্বত অভিযানের কথা বলতে তিনি একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। দু-দুবার আমার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে ওঁর এই প্রৌঢ় বয়সে ভ্রমণের নেশা চাগিয়ে উঠেছে। তিব্বত জায়গাটা খুব আরামের নয়, এবং অনেক অজানা দুর্গম জায়গায় আমাদের যেতে হবে শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'সে হোক গে। শিবের পাহাড় কৈলাসটা যদি একবার চাক্ষুষ দেখতে পারি তো আমার হিন্দুজন্ম সার্থক।' কৈলাস যে তিব্বতে সেটা জানলেও তার পাশের বিখ্যাত হ্রদটির কথা অবিনাশবাবু জানতেন না। বললেন, 'সে কী মশাই মানস সরোবর তো কাশ্মীরে বলে জানতুম!'

একশৃঙ্গ আর উড়ন্ত লামার কথাটা আর অবিনাশবাবুকে বললাম না, কারণ ও দুটো নিয়ে এখনও আমার মনে খটকা রয়ে গেল। খাম্‌পা দস্যুদের কথাটা বলাতে ভদ্রলোক বললেন,

pdfbangla.blogspot.com

'তাতে ভয়ের কী আছে মশাই? আপনার ওই হুনলুলু পিস্তল দিয়ে ওদের সাবাড় করে দেবেন।' অ্যানাইহিলিন যে হুনলুলু কী করে হল জানি না।

কাঠগোদাম থেকেই যাওয়া স্থির করেছি। আজ সন্ডার্সকে টেলিগ্রামে জানিয়ে দিয়েছি যে আমি পয়লা কাঠগোদাম পৌঁছাব। জিনিসপত্র বেশি নেওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। অবিনাশবাবুকেও সেটা বলে দিলাম। উনি আবার পাশবালিশ ছাড়া ঘুমোতে পারেন না, তাই ওঁর জন্যে ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায় এমন একটা লম্বাটে বালিশ তৈরি করে দেব বলেছি। শীতে পরার জন্য আমারই আবিষ্কৃত শ্যাঙ্কলন প্লাস্টিকের হালকা পোশাক নিচ্ছি, এয়ার কন্ডিশনিং পিল নিচ্ছি, বেশি উঁচুতে উঠলে যাতে নিশ্বাসের কষ্ট না হয় তার জন্য আমার তৈরি অক্সিমোর পাউডার নিচ্ছি। এ ছাড়া অমনিস্কোপ ক্যামেরাপিড ইত্যাদি তো নিচ্ছিই। সব মিলিয়ে পাঁচ সেরের বেশি ওজন হবার কথা নয়। পায়ে পরার জন্য পশমের বুট আলমোড়াতেই পাওয়া যাবে।

ক'দিন হল খুব গুমোট হয়েছে। এইবার ঘোর বর্ষা শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে। হিমালয়ের প্রাচীর পেরিয়ে একবার তিব্বতে পৌঁছাতে পারলে মনসুন আর আমাদের নাগাল পাবে না।

১০ই আগস্ট। গারবেয়াং।

এর মধ্যে ডায়রি লেখার সময় পাইনি। আমরা তেসরা কাঠগোদাম ছেড়ে মোটরে করে আলমোড়া পর্যন্ত এসে, তারপর ঘোড়া করে উত্তরপূর্বগামী পাহাড়ে রাস্তা ধরে প্রায় দেড়শো মাইল অতিক্রম করে কাল সন্ধ্যায় গারবেয়াং এসে পৌঁছেছি।

গারবেয়াং দশ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত একটা ভুটিয়া গ্রাম। আমরা এখনও ভারতবর্ষের মধ্যেই রয়েছি। আমাদের পুবদিকে খাদের নীচ দিয়ে কালী নদী বয়ে চলেছে। নদীর ওপারে নেপাল রাজ্যের ঘন ঝাউবন দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে আরও বিশ মাইল উত্তরে গিয়ে ১৬০০০ ফুট উঁচুতে একটা গিরিবর্ত পেরিয়ে লিপুধুরা। লিপুধুরা পেরোলেই ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তিব্বতে প্রবেশ।

কৈলাস-মানস সরোবর তিব্বতের সীমানা থেকে মাইল চল্লিশেক। দূরত্বের দিক দিয়ে বেশি নয় মোটেই, কিন্তু দুর্গম গিরিপথ, বেয়াড়া শীত, আর তার সঙ্গে আরও পাঁচরকম বিপদআপদের কথা কল্পনা করে ভারতবর্ষের শতকরা ৯৯.৯ ভাগ লোকই আর এদিকে আসার নাম করে না। অথচ এই পথটুকু আসতেই আমরা যা দৃশ্যের নমুনা পেয়েছি, এর পরে না জানি কী আছে সেটা ভাবতে এই বয়সেও আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

এবার আমাদের দলটার কথা বলি। সন্ডার্স ও ক্রোল ছাড়া আরও একজন বিদেশি আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন। এঁর নাম সের্গেই মার্কোভিচ। জাতে রাশিয়ান, থাকেন পোল্যান্ডে। ইংরিজিটা ভালই বলেন। আমাদের মধ্যে ইনিই অপেক্ষাকৃত কমবয়সি। দোহারা লম্বা চেহারা, ঘোলাটে চোখ, মাথায় একরাশ অবিন্যস্ত তামাটে চুল, ঘন ভুরু, আর ঠোঁটের দুপাশে ঝুলে থাকা লম্বা গোঁফ। এঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ আলমোড়াতেই। ইনিও নাকি তিব্বত যাচ্ছিলেন, তার একমাত্র কারণ ভ্রমণের নেশা, তাই আমরা যাচ্ছি শুনে আমাদের দলে ভিড়ে পড়লেন। এমনিতে হয়তো লোক খারাপ নন, কিন্তু ঠোঁট হাসলেও চোখ হাসে না দেখে মনে হয় তেমন অবস্থায় পড়লে খুনখারাপিতেও পেছ-পা হবেন না। সেই কারণেই বোধ হয় ক্রোলের একে পছন্দ না। ক্রোলের নিজের হাইট সাড়ে পাঁচ ফুটের বেশি না। টেকো মাথার দুপাশে সোনালি চুল কানের উপর এসে পড়েছে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। তবে আদৌ হিংস্র নয়। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে পাঁচবার ম্যাটারহর্নের চুড়োয় উঠেছে। লোকটা

priyoboi.blogspot.com

মাঝে মাঝে বেজায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, তিনবার নাম ধরে ডাকলে তবে জবাব দেয়। আর প্রায়ই দেখি ডান হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে কী যেন হিসেব করে। আমরা যেমন কড়ে আঙুল থেকে শুরু করে পাঁচ আঙুলের গাঁটে গাঁটে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত গুনতে পারি, ইউরোপের লোকেরা দেখেছি সেটা একেবারেই পারে না। এরা একটা আঙুলে এক গোনে। গাঁটের ব্যবহারটা বোধ হয় ভারতীয়।

সন্ডার্স আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট। সুগঠিত সুপুরুষ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত হালকা নীল চোখ, প্রশস্ত ললাট। সে এই ক'দিনে তিব্বত সম্বন্ধে খানদশেক বই পড়ে অভিযানের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে। যোগবল বা ম্যাজিকে তার বিশ্বাস নেই। এসব বই পড়েও সে বিশ্বাস জাগেনি, এবং এই নিয়ে ক্রোলের সঙ্গে তার মাঝে মাঝে তর্কবিতর্কও হচ্ছে।

এই তিনজন ছাড়া অবিশ্যি রয়েছেন আমার প্রতিবেশী তীর্থযাত্রী শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, যিনি আপাতত আমাদের থেকে বিশ হাত দূরে খাদের পাশে একটা পাথরের খণ্ডে বসে হাতে তামার পাত্রে তিব্বতি চা নিয়ে কাছেই খুঁটির সঙ্গে বাঁধা একটা ইয়াক বা চমরি গাইয়ের দিকে চেয়ে আছেন। আজ সকালেই ভদ্রলোক বলছিলেন, 'মশাই, সেই ছেলেবেলা থেকে পুজোর কাজে চামরের ব্যবহার দেখে আসছি, আর অ্যাদ্দিনে তার উৎপত্তিস্থল দেখলাম।' সাদা চমরির ল্যাজ দিয়েই চামর তৈরি হয়। এখানে যে চমরিটা রয়েছে সেটা অবিশ্যি কালো।

আমরা বাকি চারজনে বসেছি একটা ভুটিয়ার দোকানের সামনে। সেই দোকান থেকেই কেনা তিব্বতি চা ও সাম্পায় আমরা ব্রেকফাস্ট সারছি। সাম্পা হল গমের ছাতুর ডেলা। জলে বা চায়ে ভিজিয়ে খেতে হয়। এই চা কিন্তু আমাদের ভারতীয় চা নয়। এ চা চিন দেশ থেকে আসে, এর নাম ব্রিক-টি। দুধ চিনির বদলে নুন আর মাখন দিয়ে এই চা তৈরি হয়। একটা লম্বা বাঁশের চোঙার মধ্যে চা ঢেলে আরেকটা বাঁশের ডান্ডা দিয়ে মোক্ষম ঘাঁটান দিলে চায়ে-মাখনে একাকার হয়ে এই পানীয় প্রস্তুত হয়। তিব্বতিরা এই চা খায় দিনে ত্রিশ-চল্লিশ বার। চা আর সাম্পা ছাড়া আরও যেটা খায় সেটা হল ছাগল আর চমরির মাংস। এসব হয়তো আমাদেরও খেতে হবে, যদিও চাল ডাল সবজি কফি টিনের খাবার ইত্যাদি আমরা সঙ্গে নিয়েছি। সে সব যতদিন চলে চলবে, তারপর সব কিছু ফুরোলে রয়েছে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণানাশক বড়ি বটিকা ইন্ডিকা।

অবিনাশবাবু আমায় শাসিয়ে রেখেছেন—'আমাকে মশাই আপনার ওই সাহেব বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে বলবেন না। আপনি চৌষট্টিটা ভাষা জানতে পারেন, আমার বাংলা বই আর সম্বল নেই। সকাল সন্ধ্যে গুড মর্নিং গুড ইভনিংটা বলতে পারি, এমনকী ওনাদের কেউ খাদেটাদে পড়ে গেলে গুড বাইটাও মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে—তার বেশি আর কিছু পাবেন না। আপনি বরং বলে দেবেন যে আমি একজন মৌনী সাধু, তীর্থ করতে যাচ্ছি।' সত্যিই অবিনাশবাবু খুবই কম কথা বলছেন। আমি একা থাকলেও কথা বলেন ফিসফিস করে। একটা সুবিধে এই যে ভদ্রলোকের ঘোড়া চড়তে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। এসব অঞ্চলে ঘোড়া ছাড়া গতি নেই। ছ'টা ঘোড়া, মাল বইবার জন্য চারটে চমরি আর আটজন ভুটিয়া কুলি আমরা সঙ্গে নিচ্ছি।

উইলার্ডের ডায়রিটা নিজের চোখে দেখে আমার ইউনিকর্ন ও উড়ন্ত লামা সম্পর্কে কৌতূহল দশগুণ বেড়ে গেছে। এখানে একদল তিব্বতি পশমের ব্যাপারি এসেছে, তাদের একজনের সঙ্গে আলাপ করে একশৃঙ্গ জানোয়ারে কথা জিজ্ঞেস করাতে সে বোধ হয় আমাকে পাগল ভেবে দাঁত বার করে হাসতে লাগল! উড়ন্ত লামার কথা জিজ্ঞেস করাতে সে বলল সব লামাই নাকি উড়তে পারে। আসলে এদের সঙ্গে কথা বলে কোনও ফল হবে না। উইলার্ডের সৌভাগ্য আমাদের হবে কি না জানি না। একটা সুখবর আছে এই যে, উইলার্ডের ১১ই মার্চের ডায়রিতে একটা জায়গার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে যেটার নাম দেওয়া নেই, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান দেওয়া আছে। সেটা হল ল্যাটিচিউড ৩৩.৩ নর্থ আর লঙ্গিচিউড ৮৪ ইস্ট। ম্যাপ খুলে দেখা যাচ্ছে সেটা কৈলাসের প্রায় একশো মাইল উত্তর-পশ্চিমে চাংথাং অঞ্চলে। এই চাংথাং ভয়ানক জায়গা। সেখানে গাছপালা বলতে কিছু নেই, আছে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত বালি আর পাথরে মেশানো রুক্ষ জমির মাঝে মাঝে একেকটা হ্রদ। মানুষ বলতে এক যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা ছাড়া কেউ থাকে না ওখানে। শীতও নাকি প্রচণ্ড। আর তার উপরে আছে বরফের ঝড়—যাকে বলে ব্লিজার্ড—যা নাকি সাতপুরু পশমের জামা ভেদ করে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

সবই সহ্য হবে যদি যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়। অবিনাশবাবু বলছেন, 'কোনও ভাবনা নেই।

ভক্তির জোর, আর কৈলাসেশ্বরের কৃপায় আপনাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

৪ঠা আগস্ট। পুরাং উপত্যকা।

১২০০০ ফুট উঁচুতে একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর ধারে আমরা ক্যাম্প ফেলেছি। হাপরের সাহায্যে ধুনি জ্বালিয়ে তার সামনে মাটিতে কম্বল বিছিয়ে বসেছি। বিকেল হয়ে আসছে; চারদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা এই জায়গাটা থেকে রোদ সরে গিয়ে আবহাওয়া দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আশ্চর্য এই যে, এখানে সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি দুর্জয় শীত হলেও দুপুরের দিকে তাপমাত্রা চড়ে গিয়ে মাঝে মাঝে ৮০।৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উঠে যায়।

গারবেয়াং থেকে রওনা হবার আগে, চড়াই উঠতে হবে বলে নিশ্বাসের যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য আমি সকলকে অক্সিমোর পাউডার অফার করি। সন্ডার্স ও অবিনাশবাবু আমার ওষুধ খেলেন। ক্রোল বলল সে জার্মানির পার্বত্য অঞ্চলে মাইনিঙ্গেন শহরে থাকে, ছেলেবেলা থেকে পাহাড়ে চড়েছে, তাই তার ওষুধের দরকার হবে না। মার্কোভিচকে জিজ্ঞেস করাতে সেও বলল ওষুধ খাবে না। কেন খাবে না তার কোনও কারণ দিল না। বোধ হয় আমার তৈরি ওষুধে তার আস্থা নেই। সে যে অত্যন্ত মূর্খের মতো কাজ করেছে সেটা পরে নিজেও বুঝতে পেরেছিল। ঘোড়ায় চড়ে দিব্যি চলেছিলাম আমরা পাহাড়ে পথ ধরে। বেঁটে বেঁটে তিব্বতি ঘোড়ার পিঠে আমরা পাঁচজন, আর আমাদের পিছনে কুলি আর মালবাহী চমরির দল। ষোলো হাজার ফুটে গুরুপ-লা গিরিবর্ত্ম পেরোতেই হিমেল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ছাপিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ আমাদের কানে এল। আমাদের মধ্যে কে যেন প্রচণ্ড জোরে হাসতে শুরু করেছে।

এদিক ওদিক চেয়ে একটু হিসেব করে শুনে বুঝতে পারলাম হাসিটা আসছে সবচেয়ে সামনের ঘোড়ার পিঠ থেকে। পিঠে রয়েছেন শ্রীমান সেরগেই মার্কোভিচ। তার হাসিটা এমনই বিকট ও অস্বাভাবিক যে আমাদের দলটা আপনা থেকেই থেমে গেল।

মার্কোভিচও থেমেছে। এবার সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। তারপর তার সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে অত্যন্ত বেপরোয়া ও বেসামাল ভাবে সে রাস্তার ডান দিকে এগোতে লাগল। ডাইনে খাদ, আর সে খাদ দিয়ে একবার গড়িয়ে পড়লে অন্তত দু হাজার ফুট নীচে গিয়ে সে গড়ানো থামবে, এবং অবিনাশবাবুর 'গুড বাই' বলার সুযোগ এসে যাবে।

সন্ডার্স, ক্রোল ও আমি ঘোড়া থেকে নেমে ব্যস্তভাবে মার্কোভিচের দিকে এগিয়ে গেলাম। লোকটার চোখ ঘোলাটে; তার হাসিও ঘোলাটে মনের হাসি। এবারে বুঝতে পারলাম তার কী হয়েছে। বারো হাজার ফুটের পর থেকেই আবহাওয়ায় অক্সিজেনের রীতিমতো অভাব হতে শুরু করে। কোনও কোনও লোকের বেলায় সেটা নিশ্বাসের কষ্ট ছাড়া আর কোনও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে না। কিন্তু একেকজনের ক্ষেত্রে সেটা রীতিমতো মস্তিষ্কের বিকার ঘটিয়ে দেয়। তার ফলে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে, কেউ ভুল বকে, আবার কেউ বা অজ্ঞান হয়ে যায়। মার্কোভিচকে হাসিতে পেয়েছে। আমাদের কুলিরা বোধ হয় এ ধরনের ব্যারাম কখনও দেখেনি, কারণ তারা দেখছি মজা পেয়ে নিজেরাও হাসতে শুরু করে দিয়েছে। ন'টি পুরুষের অট্টহাসি এখন চারিদিকে পাহাড় থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ক্রোল হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'ওকে মারি একটা ঘুঁষি?'

আমি তো অবাক। বললাম, 'কেন, ঘুঁষি মারবে কেন? ওর তো অক্সিজেনের অভাবে ওই অবস্থা হয়েছে।'

‘সেই জন্যেই তো বলছি। এই অবস্থায় ওকে তোমার ওষুধ খাওয়াতে পারবে না। বেহুঁশ হলে জোর করে গেলানো যেতে পারে।’

এরপরে আমি কিছু বলার আগেই ক্রোল মার্কোভিচের দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুঁষিতে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। অজ্ঞান অবস্থার তার মুখ হাঁ করে তার গলায় আমার পাউডার গুঁজে দিলাম। দশ মিনিট পরে জ্ঞান হয়ে ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে এদিক ওদিক দেখে তার চোয়ালে হাত বুলোতে বুলোতে সুবোধ বালকের মতো তার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। আমরা সকলে আবার রওনা দিলাম।

priyoboi.blogspot.com

পুরাঙে এসে ক্যাম্প ফেলে আগুন জ্বেলে বসবার পর ক্রোল ও সন্ডার্সের সঙ্গে ইউনিকর্ন নিয়ে কথা হল। সন্ডার্স বলল, ‘বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে হঠাৎ একটা নতুন জাতের জানোয়ার আবিষ্কার করাটা কী সাংঘাতিক ব্যাপার বলো তো! আর, একটা আধটা নয়, একেবারে দলে দলে।’

ইউনিকর্ন থেকে আলোচনাটা আরও অন্য কাল্পনিক প্রাণীতে চলে গেল। সত্যি, পুরাকালে কতরকমই না উদ্ভট জীবজন্তু সৃষ্টি করেছে মানুষের কল্পনা। অবিশ্যি কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন যে এ সব নিছক কল্পনা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ যে সব প্রাণীদের দেখত, তার আবছা স্মৃতি নাকি অনেক যুগ পর্যন্ত মানুষের মনে থেকে যায়। সেই স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা জুড়ে মানুষই আবার এই সব উদ্ভট প্রাণীর সৃষ্টি করে। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক টেরোড্যাকটিল বা ঈপিয়র্নিস পাখির স্মৃতি থেকেই হয়তো সৃষ্টি হয়েছে গরুড় বা জটায়ু বা আরব্যোপন্যাসের সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের অতিকায় রক পাখি—যার ছানার খাদ্য ছিল একটা আস্ত হাতি। মিশর দেশের উপকথায় তি-বেন্নু পাখির কথা আছে, পরে ইউরোপে যার নাম হয়েছিল ফিনিক্স। এই ফিনিক্সের নাকি মৃত্যু নেই। একটা সময় আসে যখন সে নিজেই নিজেকে আগুনে

পুড়িয়ে মেরে ফেলে, আর পরমুহূর্তেই তার ভস্ম থেকে নতুন ফিনিক্স জন্ম নেয়। আর আছে ড্র্যাগন—যার অস্তিত্বে পূর্ব-পশ্চিম দুদিকের লোকই বিশ্বাস করত। তফাত এই যে পশ্চিমের ড্র্যাগন ছিল অনিষ্টকারী দানব, আর চিন বা তিব্বতের ড্র্যাগন ছিল মঙ্গলময় দেবতা।

এইসব আলোচনা করতে করতে আমি মার্কোভিচের কথাটা তুললাম। আমার মতে তাকে আমাদের অভিযানের আসল উদ্দেশ্যটা জানানো দরকার। চাংথাং অঞ্চলের ভয়াবহ চেহারাটাও তার কাছে পরিষ্কার করা দরকার। সেটা জেনেও যদি সে আমাদের সঙ্গে যেতে চায় তো চলুক, আর না হলে হয় সে নিজের রাস্তা ধরুক, না হয় দেশে ফিরে যাক।

ক্রোল বলল, 'ঠিক বলেছ। যে লোক আমাদের সঙ্গে ভালভাবে মিশতে পারে না, তাকে সঙ্গে নেওয়া কী দরকার। যা বলবার এখনই বলা হোক।'

সন্ডার্স বলল সে মার্কোভিচকে পশ্চিমের তাঁবুতে যেতে দেখেছে। আমরা তিনজনে তাঁবুর ভেতর ঢুকলাম।

মার্কোভিচ একপাশে অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে বসে আছে। আমরা ঢুকতে সে মুখ তুলে চাইল। সন্ডার্স ভনিতা না করে সরাসরি উইলার্ডের ডায়রি আর একশৃঙ্গের কথায় চলে গেল। তার কথার মাঝখানেই মার্কোভিচ বলে উঠল, 'ইউনিকর্ন? ইউনিকর্ন তো আমি ঢের দেখেছি। আজকেও আসার সময় দেখলাম। তোমরা দেখনি বুঝি?'

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। মার্কোভিচ যেমন বসে ছিল তেমনই বসে আছে। সে যে ঠাট্টা করে কথাটা বলেছে সেটা তার ভাব দেখে মোটেই মনে হয় না। তা হলে কি আমার ওষুধ পুরোপুরি কাজ দেয়নি? তার মাথা কি এখনও পরিষ্কার হয়নি?

ক্রোল গুনগুন করে একটা জার্মান সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাইরে চলে গেল। বুঝলাম সে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমরা দুজনেও উঠে পড়লাম। বাইরে এলে পর ক্রোল তার পাইপ ধরিয়ে বিদ্রূপের সুরে বলল, 'এটাও কি তোমার অক্সিজেনের অভাব বলে মনে হয়?' আমি আর সন্ডার্স দুজনেই চুপ। 'আমরা নিঃসন্দেহে একটা পাগলকে সঙ্গে নিয়ে চলেছি'—বলে ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে হাতপঞ্চাশেক দূরে একটা প্রকাণ্ড পাথরের গায়ে খোদাই করা তিব্বতি মহামন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'-এর ছবি তুলতে চলে গেল।

মার্কোভিচ কি সত্যিই পাগল, না সাজা-পাগল? আমার মনটা খুঁত খুঁত করছে।

আমাদের মধ্যে অবিনাশবাবুই বোধহয় সবচেয়ে ভাল আছেন। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভদ্রলোককে দেখছি, ওঁর মধ্যে যে কোনও রসবোধ আছে তা আগে কল্পনাই করতে পারিনি। আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে উনি চিরকালই ঠাট্টা করে এসেছেন; আমার যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোও ওঁর মনে কোনওদিন বিস্ময় বা শ্রদ্ধা জাগাতে পারেনি। কিন্তু ওই যে দু'বার আমার সঙ্গে বাইরে গেলেন—একবার আফ্রিকায়, আরেকবার প্রশান্ত মহাসাগরের সেই আশ্চর্য দ্বীপে—তারপর থেকেই দেখেছি ওঁর চরিত্রে একটা বিশেষ পরিবর্তন এসেছে। ভ্রমণে মনের প্রসার বাড়ে বলে ইংরাজিতে একটা কথা আছে, সেটা অবিনাশবাবুর ক্ষেত্রে চমৎকার ভাবে ফলেছে। আজ বারবার উনি আমার কানের কাছে এসে বিড়বিড় করে গেছেন—'কৈলাস ভূধর অতি মনোহর, কোটি শশী পরকাশ, গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অপ্সরাগণের বাস।' কৈলাস সম্বন্ধে পৌরাণিক ধারণাটা অবিনাশবাবু এখনও বিশ্বাস করে বসে আছেন। আসল কৈলাসের সাক্ষাৎ পেয়ে ভদ্রলোককে কিঞ্চিৎ হতাশ হতে হবে। আপাতত উনি কুলিদের রান্নার আয়োজন দেখতে ব্যস্ত। বুনো ছাগলের মাংস রান্না করছে ওরা।

দূরে, বহুদূরে, আমরা যেই রাস্তা দিয়ে যাব সেই রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে একদল লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণ দলটাকে কতগুলো চলমান কালো বিন্দু বলে মনে হচ্ছিল। এখন তাদের চেহারাটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এদের দেখতে পেয়ে আমাদের

লোকগুলোর মধ্যে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ করছি। কারা এরা?

শীত বাড়ছে। আর বেশিক্ষণ বাইরে বসা চলবে না।

৪ঠা আগস্ট। সন্ধ্যা সাতটা।

একটা বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেল এই কিছুক্ষণ আগে। দূর থেকে যে দলটাকে আসতে দেখেছিলাম সেটা ছিল একটা খাম্‌পা দস্যুদল। এই বিশেষ দলটিই যে উইলার্ডকে আক্রমণ করেছিল তারও প্রমাণ পেয়েছি।

বাইশটা ঘোড়ার পিঠে বাইশজন লোক, তাদের প্রত্যেকের মোটা পশমের জামার কোমরে গোঁজা তলোয়ার, কুক্‌রি, ভোজালি, আর পিঠের সঙ্গে বাঁধা আদ্যিকালের গাদা বন্দুক। এ ছাড়া দলে আছে পাঁচটা লোমশ তিব্বতি কুকুর।

দলটা যখন প্রায় একশো গজ দূরে, তখন আমাদের দুজন লোক—রাবসাং ও টুণ্ডুপ—হন্তদন্ত হয়ে আমাদের কাছে এসে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে যা অস্ত্রশস্ত্র আছে তা তাঁবুর ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসুন।' আমি বললাম, 'কেন, ওদের দিয়ে দিতে হবে নাকি?' 'না, না। বিলাতি বন্দুককে ওরা সমীহ করে চলে। না হলে ওরা সব তছনছ করে লুট করে নিয়ে যাবে। ভারী বেপরোয়া দস্যু ওরা।'

আমাদের সঙ্গে তিনটে বন্দুক—একটা এনফিল্ড ও দুটো অস্ট্রিয়ান মান্‌লিখার। সন্ডার্স ও ক্রোল তাঁবু থেকে টোটা সমেত বন্দুক বার করে আনল। মার্কোভিচের বেরোবার নাম নেই, আমি প্রয়োজনে পকেট থেকে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল বার করব, তাই হাত খালি রাখতে হবে, অথচ দুজনের হাতে তিনটে বন্দুক বেমানান, তাই অবিনাশবাবুকে ডেকে তাঁর হাতে একটা মান্‌লিখার তুলে দেওয়া হল! ভদ্রলোক একবার মাত্র হাঁ হাঁ করে থেমে গিয়ে কাঁপা হাতে বন্দুকটা নিয়ে দস্যুদলের উলটো দিকে মুখ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

২

দস্যুদল এসে পড়ল। ধুমসো লোমশ তিব্বতি কুকুরগুলো আমাদের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে। তাদেরও ভাবটা দস্যুদেরই মতো। আমাদের দলের লোকগুলোর অবস্থা কাহিল। যে যেখানে ছিল সব জবুথবু হয়ে বসে পড়েছে। এই সব দস্যু সাধারণত যাযাবরদের আস্তানায় গিয়ে পড়ে সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চলে যায়। উপযুক্ত অস্ত্র ছাড়া এদের বাধা দিতে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। অবিশ্যি এরা যদি তিব্বতি পুলিশের হাতে পড়ে তা হলে এদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা আছে। গর্দান আর ডান হাতটা কেটে নিয়ে সেগুলোকে সোজা রাজধানী লাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধু ধু প্রান্তরে বরফে ঢাকা গিরিবর্ত্মের আনাচেকানাচে এদের খুঁজে বার করা মোটেই সহজ নয়। এও শুনেছি যে এই সব দস্যুদের নিজেদেরও নাকি নরকভোগের ভয় আছে। তাই এরা লুটপাট বা খুনখারাপি করে নিজেরাই, হয় কৈলাস প্রদক্ষিণ করে, না হয় কোনও উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে নিজেদের পাপের ফিরিস্তি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে নেয়।

দস্যুদের সামনে যে রয়েছে তাকেই মনে হল পালের গোদা। নাক থ্যাবড়া, কানে মাকড়ি, মাথার রুক্ষ চুল টুপির পাশ দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে, বয়স বেশি না হলেও মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে, কুতকুতে চোখে অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে আমাদের চারজনকে নিরীক্ষণ করছে। বাকি লোকগুলো যে যেখানে ছিল সেখানেই চুপ করে ঘোড়ার লাগাম ধরে অপেক্ষা করছে; বোঝা

যাচ্ছে নেতার হুকুম না পেলে কিছু করবে না।

এবারে দস্যুনেতা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। তারপর ক্রোলের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল—'পেলিং?' পেলিং মানে ইউরোপীয়। ক্রোলের হয়ে আমিই 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিয়ে দিলাম। দিয়েই খটকা লাগল। ইউরোপীয় দেখে চিনল কী করে এরা?

লোকটা এবার ধীরে ধীরে সন্ডার্সের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর তার পায়ের কাছ থেকে একটা বেক্‌ড বিনসের খালি টিন তুলে নিয়ে সেটাকে উলটেপালটে দেখে তার গন্ধ শুঁকে আবার মাটিতে ফেলে ভারী বুটের গোড়ালির এক মোক্ষম চাপে সেটাকে থেঁতলে মাটির সঙ্গে সমান করে দিল। সন্ডার্স হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে দস্যুনেতার ঔদ্ধত্য হজম করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কোত্থেকে জানি মাঝে মাঝে একটা দাঁড়কাকের গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া কেবল নদীর কুল কুল শব্দ। কুকুরগুলো আর ডাকছে না। এই থমথমের মধ্যে আবার দস্যুনেতার ভারী বুটের শব্দ পাওয়া গেল। সে এবার অবিনাশবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোক যে কেন তাকে মাথা হেঁট করে নমস্কার করলেন তা বোঝা গেল না। দস্যুনেতার বোধ হয় ব্যাপারটা ভারী কমিক বলে মনে হল, কারণ সে সশব্দে একটা বর্বর হাসি হেসে অবিনাশবাবুর হাতের বন্দুকের বাঁটে একটা খোঁচা মারল।

এবার ক্রোলের দিকে চোখ পড়াতে সভয়ে দেখলাম সে তার বন্দুকটা দস্যুনেতার দিকে উঠিয়েছে, প্রচণ্ড রাগে তার কপালের শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। আমি চোখ দিয়ে ইশারা করে তাকে ধৈর্য হারাতে মানা করলাম। ইতিমধ্যে সন্ডার্স আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ফিস ফিস করে বলল, 'দে হ্যাভ অ্যান এনফিল্ড টু।'

কথাটা শুনে অন্য দস্যুগুলোর দিকে চেয়ে দেখি তাদের মধ্যে একজন হিংস্র চেহারার লোক ঘোড়ার পিঠে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। তার কাঁধে সত্যিই একটা এনফিল্ড রাইফেল। উইলার্ডের ডায়রি থেকে জেনেছি যে তার নিজের একটা এনফিল্ড ছিল। সেটা কিন্তু আলমোড়ায় ফেরেনি। এই বন্দুক, আর ইউরোপীয়দের দেখে চিনতে পারা—এই দুটো ব্যাপার থেকে বেশ বোঝা গেল যে এই দস্যুদলই উইলার্ডের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কিন্তু তা হলেও আমাদের হাত পা বাঁধা। এরা দলে ভারী। লড়াই লাগলে হয়তো আমাদের বন্দুক আর আমার পিস্তলের সাহায্যে এদের রীতিমতো শিক্ষা দেওয়া যেত, কিন্তু সে খবর যদি অন্য খাম্‌পাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তা হলে কি তারা প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে?

লড়াইয়ের প্রয়োজন হবে কি না ভাবছি, দস্যুনেতা অসীম সাহসের সঙ্গে আমাদের পূর্বদিকের ক্যাম্পটার দিকে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। অন্য ক্যাম্পটা থেকে হঠাৎ মার্কোভিচ টলতে টলতে বেরিয়ে এল—তার ডান হাতটা সামনের দিকে তোলা, তার তর্জনী নির্দেশ করছে দস্যুদের তিব্বতি কুকুরগুলোর দিকে।

পরমুহূর্তেই তার গলায় এক অদ্ভুত উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল —'ইউনিকর্ন! ইউনিকর্ন!'

আমরা ভাল করে ব্যাপারটা বোঝার আগেই মার্কোভিচ দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল একটা বিশাল লোমশ ম্যাস্টিফ কুকুরের দিকে। হয়তো তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে মনে করেই কুকুরটা হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে একটা বিশ্রী গর্জন করে মার্কোভিচের দিকে দিল একটা লাফ।

কিন্তু মার্কোভিচের নাগাল পাবার আগেই সে কুকুর ভেলকির মতো ভ্যানিস করে গেল। এর কারণ অবশ্য আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তল। আমার ডান হাতটা অনেকক্ষণ থেকেই

priyoboi.blogspot.com

পকেটে পিস্তলের উপর রাখা ছিল। মোক্ষম মুহূর্তে সে হাত পিস্তল সমেত বেরিয়ে এসে কুকুরের দিকে তাগ করে ঘোড়া টিপে দিয়েছে।

কুকুর উধাও হবার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কোভিচ মুহ্যমান অবস্থায় মাটিতে বসে পড়ল। ক্রোল আর সন্ডার্স মিলে তাকে কোলপাঁজা করে তাঁবুর ভিতর নিয়ে গেল।

আর এদিকে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আমার পিস্তলের মহিমা দেখে দস্যুদলের মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। তারা কেউ কেউ ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েছে, কেউ আবার ঘোড়ার পিঠ থেকেই বার বার গড় করার ভাব করে উপুড় হয়ে পড়ছে। দস্যুনেতাও বেগতিক দেখে ইতিমধ্যে তার ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েছে। বাইশজন দস্যুর সম্মিলিত বেপরোয়া ভাব এক মুহূর্তে এভাবে উবে যাবে তা ভাবতে পারিনি।

এবার আমার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। যে লোকটার কাছে এনফিল্ডটা ছিল তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হয় তোমার বন্দুক দাও, না হয় তোমাদের পুরো দলকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলব।' সে কাঁপতে কাঁপতে তার কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে আমার হাতে তুলে দিল। এবার বললাম, 'এই বন্দুক যার, তার আর কী কী জিনিস তোমাদের কাছে আছে বার করো।'

এক মিনিটের মধ্যে এর ওর ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়ল দুটিন সসেজ, একটা গিলেট সেফটি রেজার, একটা আয়না, একটা বাইনোকুলার, একটা ছেঁড়া তিব্বতের ম্যাপ, একটা ওমেগা ঘড়ি, আর একটা চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ খুলে দেখি তাতে রয়েছে একটা বাইবেল, আর তিব্বত সম্বন্ধে মোরক্রফ্‌ট ও টিফেনটালেরের লেখা দুটো বিখ্যাত বই। বই দুটোতে উইলার্ডের নাম লেখা রয়েছে তার নিজের হাতে।

জিনিসগুলোকে বাজেয়াপ্ত করে সবে ভাবছি দস্যুনেতাকে কিছু সতর্কবাণী শুনিয়ে তাদের বিদায় নিতে বলব, কিন্তু তার আগেই তাদের পুরো দলটা চক্ষের নিমেষে যে পথে এসেছিল

সেই পথেই ঘোড়া ছুটিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা হয়ে আসা পাহাড়ের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আপদ বিদায় করে অবিনাশবাবুকে মান্‌লিখারের ভারমুক্ত করে পশ্চিম দিকের তাঁবুতে গেলাম মার্কোভিচের অবস্থা দেখতে। সে মাটিতে কম্বলের উপর শুয়ে আছে চোখ বুজে। মুখের উপর টর্চ ফেলতে সে ধীরে ধীরে চোখ খুলল। এইবারে তার চোখের পাতা আর মণি দেখেই বুঝতে পারলাম যে সে নেশা করেছে। আর সে নেশা সাধারণ নেশা নয়; অত্যন্ত কড়া কোনও মাদক ব্যবহার করেছে সে। হয়তো এটা তার অনেক দিনের অভ্যাস, আর তার প্রভাবেই সে যেখানে সেখানে ইউনিকর্ন দেখতে পাচ্ছে। কোকেন, হেরয়েন, মর্ফিয়া বা ওই জাতীয় কোনও মাদক খেলে বা ইঞ্জেকশন নিলে শুধু যে শরীরের ক্ষতি করে তা নয়, তা থেকে ব্রেনের বিকার ও তার ফলে চোখে ভুল দেখা কিছুই আশ্চর্য না।

মার্কোভিচের মতো নেশাখোরকে সঙ্গে নিলে আমাদের এই অভিযান ভণ্ডুল হয়ে যাবে। হয় তাকে তাড়াতে হবে, না হয় তার নেশাকে তাড়াতে হবে।

১৫ই আগস্ট সকাল ৭টা

কাল রাত্রে তাকে ডাকা সত্ত্বেও মার্কোভিচ যখন খেতে এল না, তখন নেশার ধারণাটা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হল। আমি জানি এ জাতীয় ড্রাগ বা মাদক ব্যবহার করলে মানুষের খিদে তেষ্টা অনেক কমে যায়। কথাটা বলতে সন্ডার্স একেবারে ক্ষেপে উঠল। বলল, 'ওকে সরাসরি জেরা করতে হবে এক্ষুনি।' ক্রোল বলল, 'তুমি অত্যন্ত বেশি ভদ্র, তোমাকে দিয়ে জেরা হবে না। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

খাবার পরে ক্রোল সোজা তাঁবুর ভিতর গিয়ে আধঘুমন্ত মার্কোভিচকে বিছানা থেকে হিঁচড়ে টেনে তুলে সোজা তার মুখের উপর বলল, 'তোমার কাছে কী ড্রাগ আছে বার করো। আমরা জানি তুমি নেশা করো। এ নেশা তোমার ছাড়তে হবে, নয়তো তোমাকে আমরা বরফের মধ্যে পুঁতে দিয়ে চলে যাব; কেউ টের পাবে না।'

মার্কোভিচ পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারল কি না জানি না, কিন্তু সে ক্রোলের ভাব দেখে যে ভয় পেয়েছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সে কোনওরকমে ক্রোলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ হাতড়ে তার থেকে একটা মাথার বুরুশ বার করে ক্রোলের হাতে দিল। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল এটা তার পাগলামিরই আরেকটা লক্ষণ; কিন্তু ক্রোলের জার্মান বুদ্ধি এক নিমেষে বুঝে ফেলল যে মার্কোভিচ আসল জিনিসটাই বার করে দিয়েছে। বুরুশের কাঠের অংশটায় চাড় দিতে সেটা বাক্সের ডালার মতো খুলে গেল, আর তার তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল ঠিক ট্যালকাম পাউডারের মতো দেখতে মিহি সাদা কোকেনের গুঁড়ো। আধ মিনিটের মধ্যে সে গুঁড়ো তিব্বতের হিমেল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, আর বুরুশটা নিক্ষিপ্ত হল খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর জলে।

কিন্তু শুধু কোকেন দূর করলেই তো হবে না, মার্কোভিচের নেশাটাকেও দূর করা চাই। আজ সকালে তার হাবভাবে মনে হচ্ছে আমার আশ্চর্য ওষুধ মিরাকিউরলে কাজ দিয়েছে। সে ইতিমধ্যেই চার গেলাস মাখন চা, সেরখানেক ছাগলের মাংস আর বেশ কিছুটা সাম্পা খেয়ে ফেলেছে।

৭ই আগস্ট। সাংচান ছাড়িয়ে।

এখন দুপুই আড়াইটা। আমরা মানস সরোবরের পথে একটা গুম্ফা বা তিব্বতি মঠের বাইরে বসে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছি। পথে আসতে আসতে আরও অনেক গুম্ফা দেখেছি। এগুলোর প্রত্যেকটাই একেকটা পাহাড়ের চুড়ো বেছে বেছে তার উপর তৈরি করা হয়েছে, এবং প্রত্যেকটা থেকেই চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। লামাদের সৌন্দর্যবোধ আছে এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

আমাদের সামনে উত্তর দিকে ২৫০০০ ফুট উঁচু গুর্লা-মান্ধাতা পর্বত সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া চারিদিকে আরও অনেক বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো দেখতে পাচ্ছি। আর কিছুদুর গেলেই কৈলাস-মানস সরোবরের দর্শন মিলবে, অবিনাশবাবুর যাত্রা সার্থক হবে। আপাতত মান্ধাতা দেখেই তাঁর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের সীমা নেই। বার বার বলছেন, 'গায়ে কাঁটা দিচ্ছে মশাই। মহাভারতের যুগে চলে এসেছি। উঃ কী ভয়ানক ব্যাপার!'

বলা বাহুল্য, এখনও পর্যন্ত একশৃঙ্গের কোনও চিহ্ন নেই। জানোয়ারের মধ্যে বুনো ছাগল ভেড়া গাধা চমরি এসব তো হামেশাই দেখছি। মাঝেমধ্যে এক আধটা খরগোশ ও মেঠো ইঁদুরও দেখা যায়। হরিণ আর ভাল্লুক আছে বলে জানি, কিন্তু দেখিনি। কাল রাত্রে ক্যাম্পের আশেপাশে নেকড়ে হানা দিচ্ছিল, তাঁবুর কাপড় ফাঁক করে টর্চ ফেলে তাদের জ্বলন্ত সবুজ চোখ দেখতে পাচ্ছিলাম।

সন্ডার্সের মনে একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়েছে। ওর ধারণা হয়েছে উইলার্ডও মার্কোভিচের মতো নেশা করে আজগুবি দৃশ্য দেখেছে আর আজগুবি ঘটনার বর্ণনা করেছে। উড়ন্ত লামা, ইউনিকর্ন—এরা সবই তার ড্রাগ-জনিত দৃষ্টিভ্রম। সন্ডার্স ভুলে যাচ্ছে যে আমরা আলমোড়াতে মেজর হর্টনের সঙ্গে দেখা করেছি। উইলার্ড সম্বন্ধে তার রিপোর্ট দেখেছি। তাতে ড্রাগের কোনও ইঙ্গিত ছিল না।

আমরা যে গুম্ফার সামনে বসেছি তাতে একটিমাত্র লামা বাস করেন। আমরা এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে এক অভিনব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছি। এমনিতে হয়তো যেতাম না, কিন্তু রাবসাং যখন বলল লামাটি পঞ্চাশ বছর কারুর সঙ্গে কথা বলেননি, তখন স্বভাবতই আমাদের একটা কৌতূহল হল। আমরা রাস্তা থেকে দুশো ফুট উপরে উঠে মৌনী লামাকে দর্শন করার জন্য গুম্ফায় প্রবেশ করলাম।

পাথরের তৈরি প্রাচীন গুম্ফার ভিতরে অন্ধকার, দেয়ালে শেওলা। আসল কক্ষের ভিতর পিছন দিকে একটা লম্বা তাকে সাত-আটটা মাঝারি আকারের বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে, তারমধ্যে অন্তত তিনখানা যে খাঁটি সোনার তৈরি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। প্রদীপ জ্বলছে। এক পাশে একটা পাত্রে একতাল মাখন রাখা রয়েছে, ঘিয়ের বদলে এই মাখনই ব্যবহার হয় প্রদীপের জন্য। একদিকের দেয়ালের গায়ে তাকের উপর থরে থরে সাজানো রয়েছে লাল কাপড়ে মোড়া প্রাচীন তিব্বতি পুঁথি। অবিনাশবাবু একটা বিশেষ জায়গায় আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে মশাই।' চেয়ে দেখি সেখানে একটা মড়ার খুলি রয়েছে। আমি বললাম, 'ওটা চা খাওয়ার পাত্র।' অবিনাশবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল।

মৌনী লামা ছিলেন পাশের একটা ছোট্ট অন্ধকার ঘরে। ঘরের পুবের দেয়ালে একটা খুপরি জানালা, সেই জানালার পাশে বসে লামা জপযন্ত্র ঘোরাচ্ছেন। মাথা মুড়োনো, শীর্ণ চেহারা, বসে থেকে থেকে হাত-পাগুলো অস্বাভাবিক রকম সরু হয়ে গেছে। আমরা তাঁকে একে একে অভিবাদন জানালাম, তিনি আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে লাল সুতো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর সামনে একটা নিচু কাঠের বেঞ্চিতে আমরা পাঁচজন বসলাম। লামা কথা

banglabooks.blogspot.com

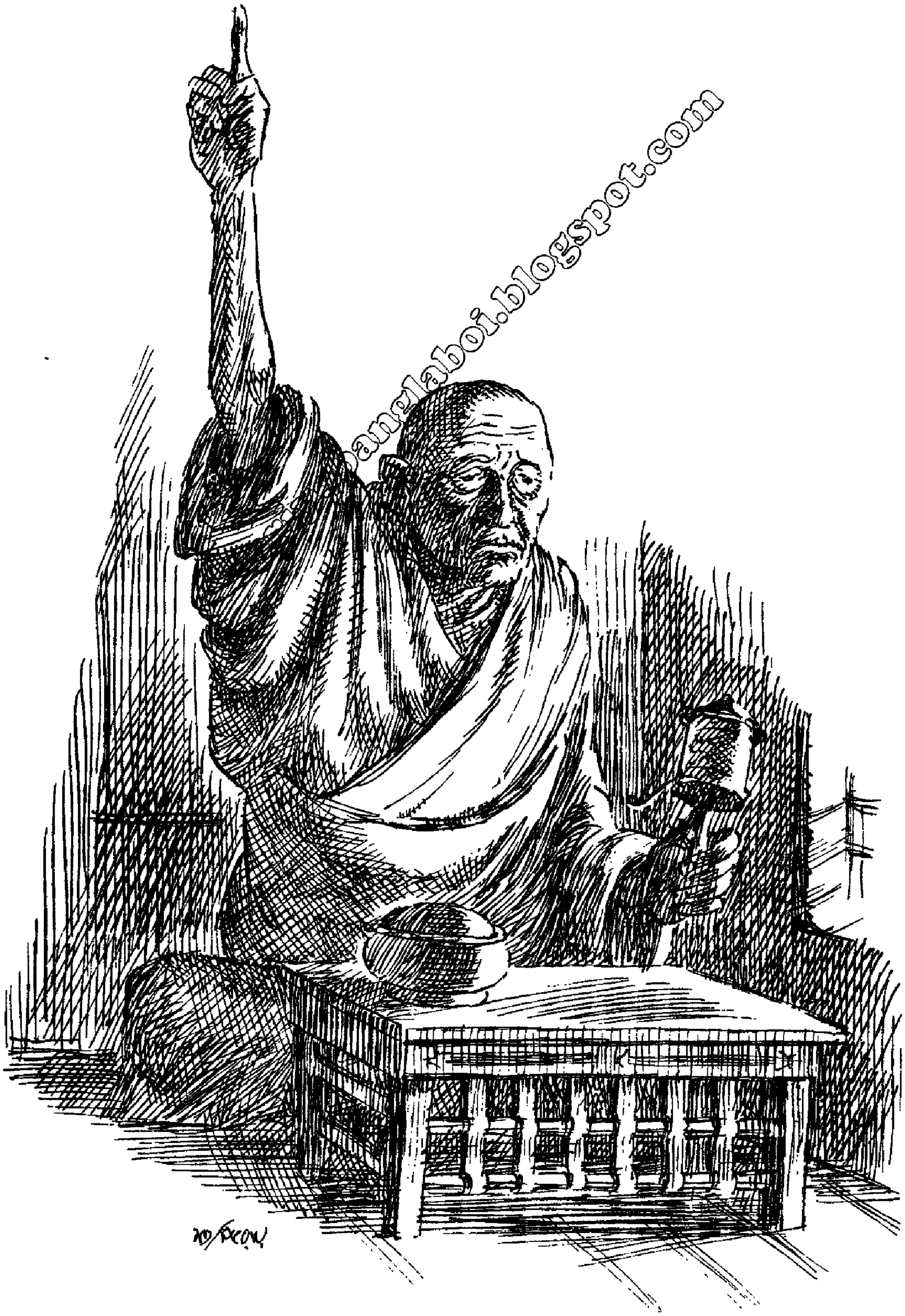

anglaboi.blogspot.com

বলবেন না, তাই তাঁকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যার উত্তর কথা না বলে দেওয়া যায়। আমি আর সময় নষ্ট না করে সোজা আসল প্রশ্নে চলে গেলাম।

'তিব্বতের কোথাও একশৃঙ্গ জানোয়ার আছে কি?'

লামা কয়েক মুহূর্ত হাসি হাসি মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমাদের পাঁচ জোড়া চোখের উৎসুক দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ। এইবার তিনি ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, উপর থেকে নীচে। একবার, দুবার, তিনবার। অর্থাৎ—আছে। আমরা চাপা উৎকণ্ঠায় আড় চোখে একবার পরস্পরের দিকে চেয়ে নিলাম। কিন্তু লামা যে আবার মাথা নাড়ছেন! এবার পাশাপাশি। অর্থাৎ—নেই।

এটা কীরকম হল? এর মানে কী হতে পারে? আগে ছিল, কিন্তু এখন নেই? ক্রোল আমাকে ফিসফিসে গলায় বলল, 'কোথায় আছে জিজ্ঞেস করো।' মার্কোভিচও দেখছি অত্যন্ত মন দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছে। এই প্রথম সে সুস্থ অবস্থায় আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্যের কথা শুনল।

ক্রোলের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রশ্নটা করাতে লামা তাঁর শীর্ণ বাঁ হাতটা তুলে উত্তর-পশ্চিম দিকে ইঙ্গিত করলেন। আমরা তো ওই দিকেই যাচ্ছি। কৈলাশ ছাড়িয়ে চাংথাং অঞ্চলে! আমি এবার আরেকটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।

'আপনি যোগীপুরুষ। ভূত ভবিষ্যৎ আপনার জানা। আপনি বলুন তো আমরা এই আশ্চর্য জানোয়ার দেখতে পাব কি না।'

লামা আবার মৃদু হেসে মাথা নাড়লেন। উপর থেকে নীচে। তিনবার।

ক্রোল রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এবার বেশ জোরেই বলল, 'আস্ক হিম অ্যাবাউট ফ্লাইং লামাজ।'

আমি লামার দিকে ফিরে বললাম, 'আমি আপনাদের মহাযোগী মিলারেপার আত্মজীবনী পড়েছি। তাতে আছে তিনি মন্ত্রবলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যেতে পারতেন। এখনও এমন কোনও তিব্বতি যোগী আছেন কি যিনি এই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী?'

মৌনী লামার চাহনিতে যেন একটা কাঠিন্যের ভাব ফুটে উঠল। তিনি এবার বেশ দৃঢ়ভাবেই মাথাটাকে নাড়লেন। পাশাপাশি। অর্থাৎ না, নেই। তারপর তিনি তাঁর ডানহাতের তর্জনীটা খাড়া করে সেই অবস্থায় পুরো হাতটাকে মাথার উপর তুলে কিছুক্ষণ ধরে ঘোরালেন। তারপর হাত নামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের উঁচোনো তর্জনীটাকে চাপ দিয়ে নামিয়ে দিলেন। মানেটা বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না: মিলারেপা একজনই ছিলেন। তিনি মন্ত্রবলে উড়তে পারতেন। তিনি এখন আর নেই।

গুম্ফা থেকে বেরোনোর আগে আমরা কিছু চা আর সাম্পা মৌনী লামার জন্যে রেখে এলাম। এখানকার যাত্রী ও যাযাবরদের মধ্যে যারা মৌনী লামার কথা জানে তারা এই গুম্ফার পাশ দিয়ে গেলেই লামার জন্যে কিছু না কিছু খাবার জিনিস রেখে যায়।

বাইরে এসে সন্ডার্স আর ক্রোলের মধ্যে তর্ক লেগে গেল। সন্ডার্স লামার সংকেতে আমল দিতে রাজি নয়। বলল, 'একবার হ্যাঁ, একবার না—এ আবার কী? আমার মতে হ্যাঁ-য়ে না-য়ে কাটাকাটি হয়ে কিছুই থাকে না। অর্থাৎ আমরা বৃথা সময় নষ্ট করছি।'

ক্রোল কিন্তু লামার সংকেতের সম্পূর্ণ অন্য মানে করেছে। সে বলল, 'আমার কাছে মানেটা খুব স্পষ্ট। হ্যাঁ মানে ইউনিকর্ন আছে, আর না মানে সেটা এমন জায়গায় আছে যেখানে আমাদের যেতে সে বারণ করছে। কিন্তু বারণ করলেই তো আর আমরা বারণ মানছি না।'

মার্কোভিচ এইবার প্রথম আমাদের কথায় যোগ দিল। সে বলল, 'ইউনিকর্ন যদি সত্যিই

পাওয়া যায়, তা হলে সেটাকে নিয়ে আমরা কী করব সেটা ভেবে দেখা হয়েছে কি?'

লোকটা কী জানতে চাইছে সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল না। ক্রোল বলল, 'সেটা আমরা এখনও ভেবে দেখিনি। আপাতত জানোয়ারটাকে খুঁজে বার করাই হচ্ছে প্রধান কাজ।'

'হুঁ' বলে মার্কোভিচ চুপ মেরে গেল। মনে হল তার মাথায় কী যেন একটা ফন্দি খেলছে। কোকেনমুক্ত হবার পর থেকেই দেখছি তার উদ্যম অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ করে লামাদের সম্পর্কে তার একটা বিশেষ কৌতূহল লক্ষ করছি, যার জন্য কাল থেকে নিয়ে সাতবার সে দল ছেড়ে পাহাড়ে উঠে গুম্ফা দেখতে গেছে। কোকেনখোর কি শেষটায় ধর্মজ্ঞানী হয়ে দেশে ফিরবে?

৩

৯ই আগস্ট, সকাল দশটা।

আমরা এইমাত্র চুসুং-লা গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে রাবণ হ্রদ ও তার পিছনে কৈলাসের তুষারাবৃত ডিম্বাকৃতি শিখরের সাক্ষাৎ পেলাম। এই রাবণ হ্রদের তিব্বতি নাম রাক্ষস-তাল, আর কৈলাসকে এরা বলে কাং-রিমপোচে। হ্রদটা তেমন পবিত্র কিছু নয়, কিন্তু কৈলাস দেখামাত্র আমাদের কুলিরা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। অবিনাশবাবু প্রথমে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। শেষটায় খেয়াল হওয়ামাত্র একসঙ্গে শিবের আট-দশটা নাম উচ্চারণ করে হাঁটুগেড়ে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকাতে লাগলেন। রাবণ হ্রদের পুব দিকে মানস সরোবর। কালই পৌঁছে যাব বলে মনে হয়।

১০ই আগস্ট, দুপুর আড়াইটা।

মানস সরোবরের উত্তর পশ্চিমে একটা জলকুণ্ডের ধারে বসে আমরা বিশ্রাম করছি। আমাদের বাঁ দিকের চড়াইটা পেরিয়ে খানিকটা পথ গেলেই হ্রদের দেখা পাব।

গত এক মাসে এই প্রথম আমরা সকলে স্নান করলাম। প্রচণ্ড গরম জল, তাতে সালফার বা গন্ধক রয়েছে। জলের উপর ধোঁয়া আর শেওলার আবরণ। আশ্চর্য তাজা বোধ করছি স্নানটা করে।

এখন ডায়রি লিখতাম না, কিন্তু একটা ঘটনা ঘটে গেছে যেটা লিখে রাখা দরকার।

আমি আর অবিনাশবাবু কুণ্ডের পশ্চিম দিকটায় নেমেছিলাম, আর সাহেব তিনজন নেমেছিলেন দক্ষিণ দিকে। স্নান সেরে ভিজে কাপড় শুকোনোর অপেক্ষায় বসে আছি, এমন সময় ক্রোল আমার কাছে এসে গল্প করার ভান করে হাসি হাসি মুখে চাপা গলায় বলল, 'খুব জটিল ব্যাপার।' আমি বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

'মার্কোভিচ। লোকটা ভণ্ড, জোচ্চোর।'

'আবার কী করল?'

আমি জানি ক্রোল মার্কোভিচকে মোটেই পছন্দ করে না। বললাম, 'ব্যাপারটা খুলে বলো।'

ক্রোল সেইরকম হাসি হাসি ভাব করেই বলতে লাগল, 'একটা পাথরের পিছনে আমাদের গরম জামাগুলো খুলে আমরা জলে নেমেছিলাম। আমি একটা ডুব দিয়েই উঠে পড়ি। মার্কোভিচের কোট আমার কোটের পাশেই রাখা ছিল। ভিতরের পকেটটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাতে কী আছে দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনটে চিঠি ছিল। ব্রিটিশ ডাকটিকিট।

banglabookpdf.blogspot.com

প্রত্যেকটিই জন মার্কহ্যাম নামক কোনও ভদ্রলোককে লেখা।'

'মার্কহ্যাম?'

'মার্কহ্যাম—মার্কোভিচ। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ কি?'

আমি বললাম, 'ঠিকানা কী ছিল?'

'দিল্লির ঠিকানা।'

জন মার্কহ্যাম...জন মার্কহ্যাম...নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি আগে? ঠিক কথা, বছর তিনেক আগের খবরের কাগজের একটা খবর। সোনা স্মাগ্‌ল করার ব্যাপারে লোকটা ধরা পড়েছিল—জন মার্কহ্যাম। জেলও হয়েছিল। কীভাবে যেন পালায়। একটা পুলিশকে গুলি করে মেরেছিল। জন মার্কহ্যাম। লোকটা ইংরেজ। ভারতবর্ষে আছে বহুদিন। নৈনিতালে একটা হোটেল চালাত। পলাতক আসামি। এখন নাম ভাঁড়িয়ে পোল্যান্ডবাসী রাশিয়ান সেজে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে। তিব্বত হবে তার গা ঢাকা দেবার জায়গা। কিংবা আরও অন্য কোনও কুকীর্তির মতলবে এসেছে এখানে। ভণ্ডই বটে। ডেঞ্জারাস লোক। ক্রোলের গোয়েন্দাগিরির প্রশংসা করতে হয়। প্রথমে ওর অন্যমনস্ক ভাব দেখে ও যে এতটা চতুর তা বুঝতে পারিনি। আমি ক্রোলকে মার্কহ্যামের ঘটনাটা বললাম।

ক্রোলের মুখে এখনও হাসি। সেটার প্রয়োজন এই কারণে যে মার্কোভিচ কুণ্ডের দক্ষিণ দিক থেকে আমাদের দেখতে পাচ্ছে। তার বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটা তাকে বুঝতে দেওয়া চলে না। ক্রোল খোশগল্পের মেজাজে একবার সশব্দে হেসে পরক্ষণেই গলা নামিয়ে বলল, 'আমার ইচ্ছা ওকে ফেলে রেখে যাওয়া। ওর তুষারসমাধি হোক। ওটাই হবে ওর শাস্তি।'

প্রস্তাবটা আমার কাছে ভাল মনে হল না। বললাম, 'না। ও আমাদের সঙ্গে চলুক। ওকে কোনওরকমেই জানতে দেওয়া হবে না যে ওর আসল পরিচয় আমরা জেনে ফেলেছি। আমাদের লক্ষ্য হবে দেশে ফিরে গিয়ে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।'

শেষপর্যন্ত ক্রোল আমার প্রস্তাবে রাজি হল। সন্ডার্সকে সুযোগ বুঝে সব বলতে হবে, আর সবাই মিলে মার্কোভিচের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

১০ই আগস্ট, বিকেল সাড়ে পাঁচটা। মানস সরোবরের উপকূলে।

মেঘদূতে কালিদাসের বর্ণনায় মানস সরোবরের রাজহাঁস আর পদ্মের কথা আছে। এসে অবধি রাজহাঁসের বদলে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনোহাঁস দেখেছি, আর পদ্ম থাকলেও এখনও চোখে পড়েনি। এ ছাড়া আজ পর্যন্ত মানস সরোবরের যত বর্ণনা শুনেছি বা পড়েছি, চোখের সামনে দেখে মনে হচ্ছে এ হ্রদ তার চেয়ে সহস্রগুণে বেশি সুন্দর। চারিদিকের বালি আর পাথরের রুক্ষতার মধ্যে এই পঁয়তাল্লিশ মাইল ব্যাসযুক্ত জলখণ্ডের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ নীল রং মনে এমনই একটা ভাবের সঞ্চার করে যার কোনও বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হ্রদের উত্তরে বাইশ হাজার ফুট উঁচু কৈলাস, আর দক্ষিণে প্রায় যেন জল থেকে খাড়া হয়ে ওঠা গুর্লা-মান্ধাতা। চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে ছোটবড় সব গুম্ফা চোখে পড়ছে, তাদের সোনায় মোড়া ছাতগুলোতে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে।

আমরা ক্যাম্প ফেলেছি জল থেকে বিশ হাত দূরে। এখানে আরও অনেক তীর্থযাত্রী ও লামাদের দেখতে পাচ্ছি। তাদের কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে হ্রদ প্রদক্ষিণ করছে, কেউ হাতে প্রেয়ার হুইল বা জপযন্ত্র ঘোরাতে ঘোরাতে পায়ে হেঁটে প্রদক্ষিণ করছে। হিন্দু বৌদ্ধ দুই ধর্মাবলম্বী লোকের কাছেই কৈলাস-মানস সরোবরের অসীম মাহাত্ম্য। ভূগোলের দিক দিয়ে এই জায়গার বিশেষত্ব হল এই যে, একসঙ্গে চারটে বিখ্যাত নদীর উৎস রয়েছে এরই

আশেপাশে। এই নদীগুলো হল ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু, সিন্ধু ও কর্ণালি।

অবিনাশবাবু এখানে এসেই বালির উপর শুয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম তো করলেনই, তারপর আমাদের সঙ্গী সাহেবদেরও 'সেক্রেড, সেক্রেড—মোর সেক্রেড দ্যান কাউ' ইত্যাদি বলে গড় করিয়ে ছাড়লেন। তারপরে যেটা করলেন সেটা অবিশ্যি বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। হ্রদের ধারে গিয়ে গায়ের ভারী পশমের কোটটা খুলে ফেলে দুহাত জোড় করে এক লাফে ঝপাং করে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেখি তাঁর দাঁতকপাটি লেগে গেছে। ক্রোল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ জলে নেমে ভদ্রলোককে টেনে তুলল। তারপর তাঁকে ব্র্যান্ডি খাইয়ে তাঁর শরীর গরম করল। আসলে মানস সরোবরের মতো এমন কনকনে ঠাণ্ডা জল ভারতবর্ষের কোনও নদী বা হ্রদে নেই। অবিনাশবাবু ভুলে গেছেন যে এখানকার উচ্চতা পনেরো হাজার

ফুট।

ভদ্রলোক এখন দিব্যি চাঙ্গা। বলছেন, ওর বাঁ হাতের বুড়োআঙুলের গাঁটে নাকি ছাব্বিশ বছর ধরে একটা ব্যথা ছিল, সেটা এই এক ঝাঁপানিতেই বেমালুম সেরে গেছে। দুটো হর্লিক্সের খালি বোতলে ভদ্রলোক হ্রদের পবিত্র জল নিয়ে নিয়েছেন, সেই জলের ছিটে দিয়ে আমাদের যাবতীয় বিপদআপদ দূর করার মতলব করেছেন।

এই অঞ্চলেই গিয়ানিমাতে একটা বড় হাট বসে। আমরা সেখান থেকে কিছু খাবার জিনিস, কিছু শুকনো ফল, ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পাথরের মতো শক্ত চমরির দুধ, আর পশমের তৈরি কিছু কম্বল ও পোশাক কিনে নিয়েছি। ক্রোল দেখি একরাশ মানুষের হাড়গোড় কিনে এনেছে, তারমধ্যে একটা পায়ের হাড় বাঁশির মতো বাজানো যায়। এ সব নাকি তার জাদুবিদ্যার গবেষণায় কাজে লাগবে। মার্কোভিচ গিয়ানিমার বাজারে কিছুক্ষণের জন্য দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল। দশ মিনিট হল সে ফিরেছে। থলিতে করে কী এনেছে বোঝা গেল না। সন্ডার্সের নৈরাশ্য অনেকটা কমেছে। সে বুঝেছে যে একশৃঙ্গের দেখা না পেলেও, মানস সরোবরের এই অপার্থিব সৌন্দর্য আর এই নির্মল আবহাওয়া—এও কিছু কম পাওয়া নয়।

কাল আমরা সরোবর ছেড়ে চাং-থাং-এর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করব। আমাদের লক্ষ্য হবে ল্যাটিচিউড ৩৩.৩ নর্থ ও লঙ্গিচিউড ৮৪ ইস্ট।

অবিনাশবাবু তাঁর পকেট-গীতা খুলে কৈলাসের দিকে মুখ করে পিঠে রোদ নিয়ে বসে আছেন। এইবার বোঝা যাবে তাঁর ভক্তির দৌড় কতদূর।

১২ই আগস্ট। চাং থাং। ল্যা. ৩০ ন—লং ৮১ই।

সকাল সাড়ে আটটা। আমরা একটা ছোট লেকের ধারে ক্যাম্প ফেলেছি। কাল রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা। বারোটার সময় মাইনাস পনেরো ডিগ্রি শীতে ক্রোল আমার ক্যাম্পে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলল, সে মার্কোভিচের জিনিসপত্র ঘেঁটে অনেক কিছু পেয়েছে। আমি তো অবাক। বললাম, 'তার জিনিস ঘাঁটলে? সে টের পেল না?'

'পাবে কী করে—কাল সন্ধেবেলা যে ওর চায়ের সঙ্গে বারবিটুরেট মিশিয়ে দিয়েছিলাম। হাতসাফাই কি আর অমনি অমনি শিখেছি? ও এখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

'কী জিনিস পেলে?'

'চলো না দেখবে।'

গায়ে একটা মোটা কম্বল চাপিয়ে আমাদের ক্যাম্প ছেড়ে ওদেরটায় গিয়ে ঢুকলাম। ঢুকতেই একটা তীব্র আধ-চেনা গন্ধ নাকে এল। বললাম, 'এ কীসের গন্ধ?'

ক্রোল বলল, 'এই তো—এই টিনের মধ্যে কী জানি রয়েছে।' টিনের কৌটোটা হাতে নিয়ে ঢাকনা খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

'এ যে কস্তুরী!'—ধরা গলায় বললাম আমি।

কস্তুরীই বটে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। তিব্বতে কস্তুরী মৃগ বা muskdeer পাওয়া যায়! সারা পৃথিবী থেকেই প্রায় লোপ পেতে বসেছে এই জানোয়ার। একটা মাঝারি কুকুরের সাইজের হরিণ, তার পেটের ভিতর পাওয়া যায় কস্তুরী নামক এই আশ্চর্য জিনিস। এটার প্রয়োজন হয় গন্ধদ্রব্য বা পারফিউম তৈরির কাজে। এক তোলা কস্তুরীর দাম হল প্রায় ত্রিশ টাকা। আসবার পথে ভারতবর্ষ ও তিব্বতের সীমানায় আসকোট শহরে এক ব্যবসাদারের কাছে জেনেছিলাম যে, তিনি একাই সরকারি লাইসেন্সে গত বছরে প্রায় চার লাখ টাকার কস্তুরী বিদেশে রপ্তানি করেছেন। আমি বললাম, 'এই কস্তুরী কি গিয়ানিমার হাটে কিনেছে

নাকি মার্কোভিচ?'

'কিনেছে?'

প্রশ্নটা করল সন্ডার্স; তার কথায় তিক্ত ব্যঙ্গের সুর। 'এই দেখো না—এগুলো কি সব ওর কেনা?'

সন্ডার্স একটা ঝোলা ফাঁক করে একরাশ কালো চমরির লোমের ভিতর থেকে পাঁচটা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি বার করল। সেগুলোর সাইজ এক বিঘতের বেশি না, কিন্তু প্রত্যেকটি মূর্তি সোনার তৈরি। এ ছাড়া আরও মূল্যবান জিনিস ঝোলায় ছিল—একটা পাথর বসানো সোনার বজ্র, একটা সোনার পাত্র, খানত্রিশেক আলগা পাথর ইত্যাদি।

'উই হ্যাভ এ রিয়েল রবার ইন আওয়ার মিড্‌স্ট' বলল সন্ডার্স। 'শুধু খাম্‌পারাই দস্যু নয়, ইনিও একটি জলজ্যান্ত দস্যু। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এ কস্তুরী সে গিয়ানিমার বাজার থেকে চুরি করে এনেছে, যেমন এই মূর্তিগুলো চুরি করেছে গুম্ফা থেকে।'

এখন বুঝতে পারলাম মার্কোভিচ কেন আমাদের দল ছেড়ে বার বার গুম্ফা দেখতে চলে যায়। লোকটার বেপরোয়া সাহসের কথা ভাবলে অবাক হতে হয়।

আজ মার্কোভিচের ভাব দেখে মনে হল যে কালকের ঘটনা কিছু টের পায়নি। তার জিনিসপত্র যেভাবে ছিল আবার ঠিক সেইভাবেই রেখে আমরা ঘুমোতে চলে যাই। যাবার আগে এটাও দেখেছিলাম যে, মার্কোভিচের সঙ্গে একটি অস্ত্রও আছে—একটা ৪৫ কোল্ট অটোম্যাটিক রিভলভার। এটার কথা মার্কোভিচ আমাদের বলেনি। সে রিভলভার অবিশ্যি তার আর কোনও কাজে লাগবে না, কারণ ক্রোল তার টোটাগুলি সযত্নে সরিয়ে ফেলেছে।

১৫ই আগস্ট। চাং থাং—ল্যা. ৩২.৫ ন, লং ৮২ ই। বিকেল সাড়ে চারটা

চাং থাং অঞ্চলের ভয়াবহ চেহারাটা ক্রমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এই জায়গার উচ্চতা সাড়ে ষোলো হাজার ফুট। আমরা এখন একটা অসমতল জায়গায় এসে পড়েছি। মাঝে মাঝে ৪০০- ৫০০ ফুট উঠতে হচ্ছে, তারপর একটা গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার নামতে হচ্ছে।

কাল সকাল থেকে একটি গাছ, একটি তৃণও চোখে পড়েনি। যেদিকে দেখছি খালি বালি পাথর আর বরফ। তিব্বতিরা কিন্তু এ সব অঞ্চলেও পাথরের গায়ে তাদের মহামন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্‌' খোদাই করে রেখেছে। গুম্ফার সংখ্যা ক্রমে কমে আসছে, তবে মাঝে মাঝে এক একটা স্তূপ বা চর্টেন দেখা যায়। বসতি একেবারেই নেই।

পরশু একটা যাযাবরদের আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম। প্রায় শ'পাঁচেক মহিলা পুরুষ তাদের কাচ্চা বাচ্চা ছাগল ভেড়া গাধা চমরি নিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পশমের তাঁবু খাটিয়ে বসতি গেড়েছে। লোকগুলো ভারী আমুদে, মুখে হাসি ছাড়া কথা নেই, এই ভ্রাম্যমাণ শিকড়হীন অবস্থাতেও দিব্যি আছে বলে মনে হয়। এদের দু-একজনকে একশৃঙ্গ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে কোনও ফল হল না।

আমরা আরও উত্তরের দিকে যাচ্ছি শুনে এরা বেশ জোর দিয়ে বারণ করল। বলল, উত্তরে ডুংলুং-ডো আছে। সেটা পেরিয়ে যাওয়া নাকি মানুষের অসাধ্য। ডুংলুং-ডো কী জিজ্ঞেস করাতে যা বর্ণনা দিল তাতে বুঝলাম সেটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। তার পিছনে কী আছে কেউ জানে না। এই প্রাচীর এরা কেউই দেখেনি, কিন্তু বহুকাল থেকেই নাকি তিব্বতিরা এর কথা জানে। আদিকালে কোনও কোনও লামা নাকি সেখানে গেছে, কিন্তু গত তিনশো বছরের মধ্যে কেউ যায়নি।

banglabooks.blogspot.com

মৌনী লামার হেঁয়ালি কথাতেও যখন আমরা নিরুদ্যম হইনি, তখন যাযাবরদের বারণ আমরা মানব কেন? চার্লস উইলার্ডের ডায়রি রয়েছে আমাদের কাছে। তার কথার উপর ভরসা রেখেই আমাদের চলতে হবে।

১৮ই আগস্ট। চাং থাং—ল্যা ৩২ ন, লং ৮২.৮ ই।

একটা লেকের ধারে ক্যাম্পের ভিতর বসে ডায়রি লিখছি। আজ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। একটা প্রায় সমতল উপত্যকা দিয়ে হেঁটে চলেছি, আকাশে ঘন কালো মেঘ, মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে, এমন সময় সন্ডার্স চেঁচিয়ে উঠল—'ওগুলো কী?'

সামনে বেশ কিছু দূরে যেখানে জমিটা খানিকটা উপরের দিকে উঠছে, তার ঠিক সামনে কালো কালো অনেকগুলো কী যেন দাঁড়িয়ে আছে। জানোয়ারের পাল বলেই তো মনে হচ্ছে। রাবসাংকে জিজ্ঞেস করতে সে সঠিক কিছু বলতে পারল না। ক্রোল অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'তোমার অম্‌নিস্কোপে চোখ লাগাও।'

অম্‌নিস্কোপ দিয়ে দেখে মনে হল সেগুলো জানোয়ার, তবে কী জানোয়ার, কেন ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কিছুই বোঝা গেল না। 'শিং আছে কি?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল। সে ছেলেমানুষের মতো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে বলতে হল যে শিং আছে কি নেই তা বোঝা যাচ্ছে না।

কাছে গিয়ে ব্যাপার বুঝে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। একটা বুনো গাধার পাল, সংখ্যায় প্রায় চল্লিশটা হবে, সব ক'টা মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাবসাং এইবার ব্যাপারটা বুঝেছে। বলল, শীতকালে বরফের ঝড়ে সেগুলো মরেছে। তারপর গরমকালে বরফ গলে গিয়ে মৃতদেহগুলো সেই দাঁড়ানো অবস্থাতেই আবার বেরিয়ে পড়েছে।

আমাদের খাবারের স্টক কমে আসছে। যাযাবরদের কাছ থেকে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে কিছু চা আর মাখন কিনে নিয়েছিলাম, সেটা এখনও চলবে কিছুদিন। মাংসে আমাদের সকলেরই অরুচি ধরে গেছে। শাক সবজি গম ইত্যাদি ফুরিয়ে এসেছে। এর মধ্যে আমার তৈরি ক্ষুধাতৃষ্ণানাশক বটিকা ইন্ডিকা খেতে হচ্ছে সকলকেই। আর কিছুদিন পরে ওই বড়ি ছাড়া আর কিছুই খাবার থাকবে না। ক্রোল মেক্সিকো থেকে আরম্ভ করে বোর্নিও পর্যন্ত এগারোটা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকম ম্যাজিক প্রয়োগ করে গুণে বার করতে চেষ্টা করছে আমাদের কপালে একশৃঙ্গ দেখার সৌভাগ্য হবে কি না। পাঁচটা ম্যাজিক বলছে না, ছ'টা বলছে হ্যাঁ।

আমরা যেখানে ক্যাম্প ফেলেছি তার উত্তরে—অর্থাৎ আমরা যেদিকে যাব সেইদিকে—প্রায় ৩০-৪০ মাইল দূরে একটা অংশ দেখে মনে হচ্ছে সেখানে জমিটা যেন একটা সিঁড়ির ধাপের মতো উপর দিকে গেছে। অম্নিস্কোপ দিয়ে দেখে সেটাকে একটা টেবল মাউন্টেনের মতো মনে হচ্ছে। এটাই কি ডুংলুং-ডো? উইলার্ড তার ডায়রিতে যে জায়গার অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছে আমরা তার খুবই কাছে এসে পড়েছি।

কিন্তু উইলার্ড যাকে 'এ ওয়ান্ডারফুল মনাস্ট্রি' বলেছে সেই থোকচুম-গুম্ফা কোথায়? আর দুশো বছরের উড়ন্ত লামাই বা কোথায়?

আর ইউনিকর্নই বা কোথায়?

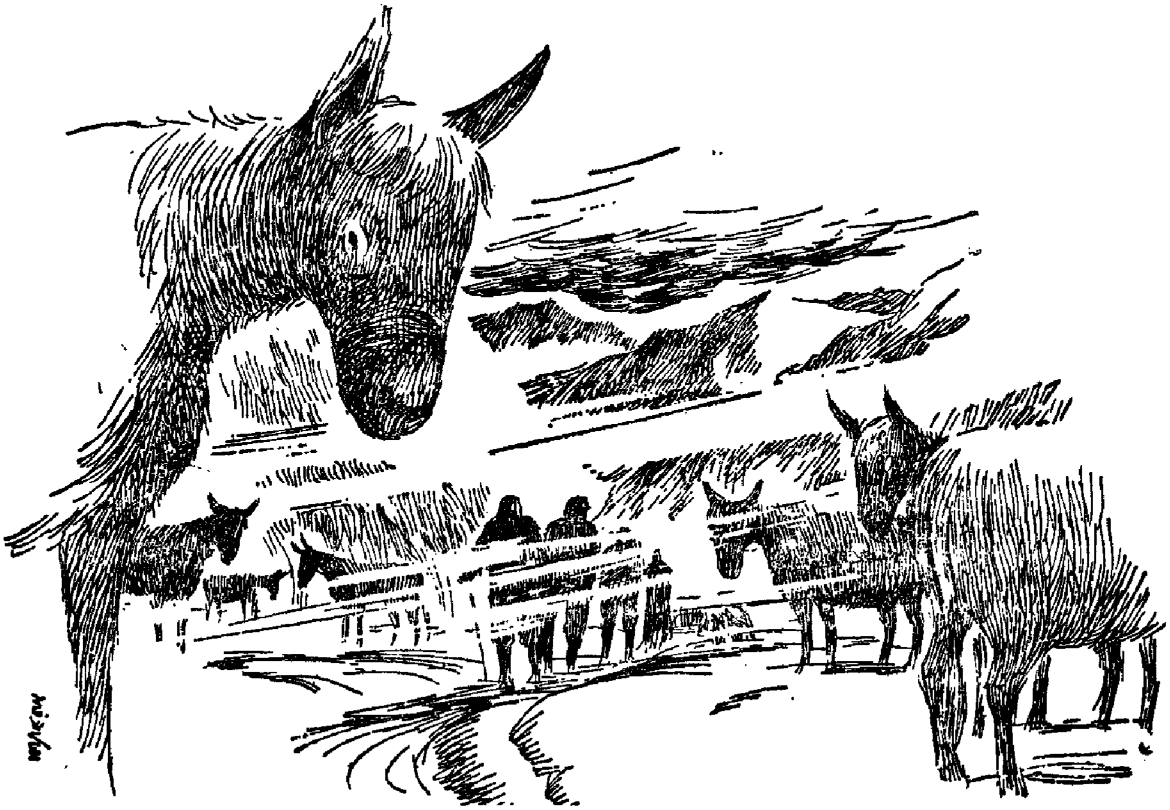

১৯শে আগস্ট।

এক আশ্চর্য গুম্ফায় এক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। এটাই যে উইলার্ডের থোকচুম-গুম্ফা তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ গুম্ফায় পৌঁছানোর তিন মিনিট আগেই রাস্তার ধারে একটা পাথরের গায়ে সেই বিখ্যাত তিব্বতি মহামন্ত্রের নীচে তিনটে ইংরাজি অক্ষর খোদাই করা দেখলাম। সি. আর. ডব্লু—অর্থাৎ চালর্স রক্সটন উইলার্ড। আগেই বলে রাখি আমাদের কুলির মধ্যে রাবসাং ও টুণ্ডুপ ছাড়া আর সকলেই পালিয়েছে। রাবসাং পালাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। সে যে শুধু বিশ্বাসী তা নয়; তার মধ্যে কুসংস্কারের লেশমাত্র নেই। তিব্বতিদের মধ্যে সে একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অন্যেরা যাবার সময় আমাদের সব ক'টা ঘোড়া এবং চারটে চমরি নিয়ে গেছে। বাকি আছে দুটো মাত্র চমরি। আমাদের তাঁবু এবং আরও কিছু ভারী জিনিস এই দুটোর পিঠে চলে যাবে। বাকি জিনিস আমাদের নিজেদের বইতে হবে। আর ঘোড়া যখন নেই, তখন বাকি পথটা হেঁটেই যেতে হবে। সেই খাড়া উঠে যাওয়া উপত্যকার অংশটা ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, আর সেই কারণেই আমাদের দলের সকলের মধ্যেই একটা চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস ওটাই ডুংলুং-ডো, যদিও ডুংলুং-ডো যে কী তা এখনও কেউ জানি না। সন্ডার্সের মতে ওটা একটা কেল্লার প্রাচীর। আমার ধারণা ওটার পিছনে একটা হ্রদ আছে, যার কোনও উল্লেখ পৃথিবীর কোনও মানচিত্রে নেই।

যে গুম্ফাটার কথা লিখতে যাচ্ছি সেটার অস্তিত্ব প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝা যায়নি। তার কারণ সেটা একটা বেশ উঁচু গ্র্যানিটের টিলার পিছনে লুকোনো ছিল। টিলাটা পেরোতেই গুম্ফাটা দেখা গেল, আর দেখামাত্র আমাদের সকলের মুখ দিয়েই নানারকম বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। সূর্য মেঘের আড়ালে থাকা সত্ত্বেও গুম্ফার জৌলুস দেখে মনে হয় তার আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মোড়া।

কাছে গিয়ে কেমন যেন ধারণা হল যে, গুম্ফায় লোকজন বেশি নেই। একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা সেটাকে ঘিরে রেখেছে। আমরা পাহাড়ে পথ দিয়ে উঠে গুম্ফায় ভিতরে ঢুকলাম। চৌকাঠ পেরোতেই মাথার উপর প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জের ঘণ্টা। ক্রোল তার দড়ি ধরে টান দিতেই গুরুগম্ভীর স্বরে সেটা বেজে উঠল, এবং প্রায় তিন মিনিট ধরে সেই ঘণ্টার রেশ গুম্ফার ভিতর ধ্বনিত হতে লাগল।

ভিতরে ঢুকেই বুঝতে পারলাম যে, সেখানে অনেকদিন কোনও মানুষের পা পড়েনি। কেবল মানুষ ছাড়া একটা গুম্ফায় যা থাকে তার সবই এখানে রয়েছে। সন্ডার্স দু-একবার 'হ্যালো হ্যালো' করেও কোনও উত্তর না পাওয়াতে আমরা নিজেরাই একটু ঘুরে দেখব বলে স্থির করলাম। ক্রোলের হাবভাবে বুঝলাম সে মার্কোভিচকে একা ছাড়বে না। সোনার প্রতি যার এমন লোভ, তাকে এখানে একা ছাড়া যায় না। সন্ডার্স হলঘরের বাঁ দিকের দরজার দিকে এগিয়ে গেল, আমি আর অবিনাশবাবু গেলাম ডান দিকে। গুম্ফার মেঝেতে ধুলো জমেছে, ইঁদুর বসবাসের চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো। আমরা দুজনে সবেমাত্র ডানদিকের ঘরে ঢুকেছি, এমন সময় একটা বিকট চিৎকারে আমাদের রক্ত জল হয়ে গেল।

সন্ডার্সের গলা। দৌড়ে গেলাম অনুসন্ধান করতে। ক্রোল, মার্কোভিচ আর আমরা দুজন প্রায় একই সঙ্গে পৌঁছোলাম বাঁ দিকের একটা মাঝারি আয়তনের ঘরে। সন্ডার্স পুবদিকের দরজার পাশে শরীরটা কুঁকড়ে ফ্যাকাশে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি ঘরের পিছন

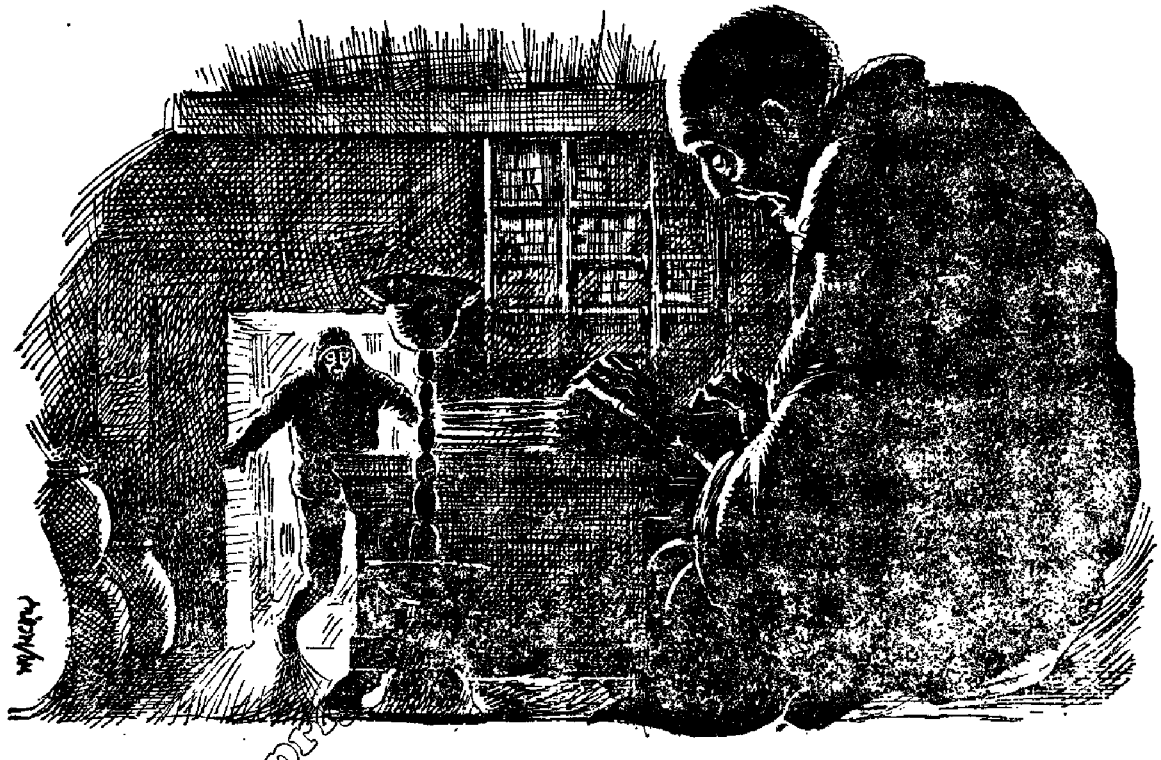

দিকে।

এবার বুঝতে পারলাম তার আতঙ্কের কারণ।

একটি অতিবৃদ্ধ শীর্ণকায় মুণ্ডিতমস্তক লামা ঘরের পিছন দিকটায় বসে আছেন পদ্মাসনের ভঙ্গিতে। তাঁর শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাঁর হাত দুটো উপুড় করে রাখা রয়েছে একটা কাঠের ডেস্কের উপর খোলা একটা জীর্ণ পুঁথির পাতায়। লামার দেহ নিস্পন্দ, তাঁর চামড়ার যেটুকু অংশ দেখা যাচ্ছে তার রং ছেয়ে নীল, আর সে চামড়ার নীচে মাংসের লেশমাত্র নেই।

লামা মৃত। কবে কীভাবে মরেছেন সেটা জানার কোনও উপায় নেই, আর কীভাবে যে তাঁর দেহ মৃত্যুজনিত বিকারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সেটাও বোঝার কোনও উপায় নেই।

সন্ডার্স এতক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছে। কিছুদিন থেকেই তার স্নায়ু দুর্বল হয়েছে, তাই সে এতটা ভয় পেয়েছে। আমি জানি আমাদের অভিযান সার্থক হলে সে নিঃসন্দেহে তার স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

এবারে আমার দৃষ্টি গেল ঘরের অন্যান্য জিনিসের দিকে। একদিকের দেয়ালের সামনে পিতল ও তামার নানারকম পাত্র। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছি। এগিয়ে গিয়ে দেখি পাত্রগুলোর মধ্যে নানা রঙের পাউডার, তরল ও চিটচিটে পদার্থ রয়েছে। সেগুলো চেনা খুব মুশকিল। অন্যদিকের দেয়ালে সারি সারি তাকে রাখা রয়েছে অজস্র পুঁথি, আর তার নীচে মেঝেতে রয়েছে আশ্চর্য সুন্দর কাজকরা পাথর বসানো আট জোড়া তিব্বতি পশমের বুটজুতো। এ ছাড়া ঘরের সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে নানারকম হাড়, মাথার খুলি, জানোয়ারের লোম ইত্যাদি। ক্রোল বলে উঠল, 'এই প্রথম একটা গুম্ফায় এসে তিব্বতি ম্যাজিকের গন্ধ পাচ্ছি।'

আমার ভয়ডর বলে কিছু নেই, তাই আমি এগিয়ে গেলাম লামার মৃতদেহের দিকে। তিনি কোন বিষয়ে অধ্যয়ন করতে করতে দেহরক্ষা করেছেন সেটা জানা দরকার। আগেই লক্ষ করেছি যে, পুঁথির অক্ষরগুলো দেবনাগরী, তিব্বতি নয়।

পুঁথিটা ধরে টান দিতে সেটা মৃত লামার হাতের তলা থেকে বেরিয়ে চলে এল আমার হাতে। লামার হাত দুটো সেই একইভাবে রয়ে গেল চৌকির দু-ইঞ্চি উপরে।

পুঁথির পাতা উলটেপালটে বুঝতে পারলাম তার বিষয়টা বৈজ্ঞানিক। ক্রোল জিজ্ঞেস করাতে বললাম, সেটা চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে, যদিও জানি আসলে তা নয়। যাই হোক, আর সময় নষ্ট না করে, সেটাকে সঙ্গে নিয়ে মৃত লামাকে সেই বসা অবস্থাতেই রেখে আমরা গুম্ফার অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় বেরিয়ে এলাম।

এখন দুপুর দুটো। আমি গুম্ফার সামনেই একটা পাথরের উপর বসে আছি। পুঁথির অনেকখানি পড়া হয়ে গেছে। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের বাইরেও কোনও কিছুর চর্চা হয়েছে, এই পুঁথিই তার প্রমাণ। অবিশ্যি এই বিশেষ লামাটি ছাড়া এই বিশেষ বিষয়টি নিয়ে কেউ চর্চা করেছে কি না সন্দেহ। এতে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। পুঁথির নাম উড্ডয়নসূত্রম্। নিছক রাসায়নিক উপায়ে মানুষ কীভাবে আকাশে উড়তে পারে তারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এতে। এই উড্ডয়নসূত্রমের কথা আমি শুনেছি। বৌদ্ধ যুগে তক্ষশীলায় একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বিদ্যুদ্ধমনী। তিনিই এই বৈজ্ঞানিক সূত্র রচনা করেন, এবং করার কিছু পরেই তিব্বত চলে যান। আর তিনি ভারতবর্ষে ফেরেননি। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ভারতবর্ষে কেউ কোনওদিন কিছু জানতে পারেনি।

পুঁথি পড়ে এক আশ্চর্য পদার্থের কথা জানা যাচ্ছে, যার নাম ংমুং। এই ংমুং-এর সাহায্যে মানুষের ওজন এত কমিয়ে দেওয়া যায় যে, একটা দমকা বাতাস এলে সে মানুষ রাজহংসের দেহচ্যুত পালকের মতো শূন্যে ভেসে বেড়াতে পারে। এই ংমুং যে কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা পুঁথিতে লেখা আছে, কিন্তু তার জন্যে যে সব প্রয়োজনীয় উপাদানের কথা বলা হয়েছে তার একটারও নাম আমি কখনও শুনিনি। বলীক, ষলক্র, ত্রিগন্ধা, অভ্রনীল, থুমা, জড়া—এই কোনওটাই আমার জানা নয়। যাঁর হাতের তলা থেকে পুঁথিটা নিয়ে এলাম তিনি নিশ্চয়ই জানতেন, এবং এই সব উপাদানের সাহায্যে তিনি নিশ্চয়ই ংমুং তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে ইনিই সেই 'টু হান্ড্রেড ইয়ার ওল্ড লামা'—যাঁর সঙ্গে উইলার্ড ওই ংমুং-এর সাহায্যেই আকাশে উড়েছিলেন। ইনি যে গত এক বছরের মধ্যে পরলোকগমন করবেন সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য; না হলে আমাদের পক্ষেও নিশ্চয়ই উইলার্ডের মতো আকাশে ওড়া সম্ভব হত।

সকলে রওনা হবার জন্য তৈরি। লেখা বন্ধ করি।

২০শে আগস্ট। ল্যা. ৩৩.৩ ন, ৮৪ লং ই।

উইলার্ডের ডায়রিতে এই জায়গাতেই ক্যাম্প ফেলার উল্লেখ আছে। আমরাও তাই করেছি। আমরা বলতে, যা ছিল তার চেয়ে দু জন কম, কারণ মার্কোভিচ ওরফে মার্কহ্যাম উধাও, আর সে-ই নিশ্চয়ই সঙ্গে করে টুণ্ডুপকে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের দুটি চমরির একটিও গেছে। আমি ক'দিন থেকেই মার্কোভিচকে মাঝে মাঝে টুণ্ডুপের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তখন অতটা গা করিনি। এখন বুঝতে পারছি ভিতরে ভিতরে একটা ষড়যন্ত্র চলছিল।

ঘটনাটা ঘটে কাল বিকেলে। গুম্ফা থেকে রওনা হবার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই আমাদের একটা প্রলয়ংকর ঝড়ে পড়তে হয়েছিল। যাকে বলে ব্লাইন্ডিং স্টর্ম। সাময়িকভাবে সত্যিই আমরা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কে কোথায় রয়েছে, কোনদিকে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড় কমলে পর দেখি দুটি মানুষ আর একটি চমরি

কম। তারউপরে যখন দেখলাম যে একটি বন্দুকও কম, তখন বুঝতে বাকি রইল না যে ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। মার্কোভিচ প্ল্যান করেই পালিয়েছে এবং তার ফেরার কোনও মতলব নেই। একদিক দিয়ে বলা যেতে পারে আপদ বিদেয় হল, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার আপশোস হল যে তার শয়তানির উপযুক্ত শাস্তি হল না। ক্রোল তো চুল ছিঁড়তে বাকি রেখেছে। বলেছে এসব লোকের সঙ্গে ভালমানুষি করার ফল হচ্ছে এই। যাই হোক, যে চলে গেছে তার কথা ভেবে আর লাভ নেই। আমরা তাকে ছাড়াই ডুংলুং-ডোর উদ্দেশে পাড়ি দেব।

উত্তরে চাইলেই এখন ডুংলুং-ডোর প্রাচীর দেখতে পাচ্ছি। এখনও মাইলপাঁচেক দূর। তা সত্ত্বেও প্রাচীরের বিশালত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। পুব-পশ্চিমে অন্তত মাইল কুড়ি-পঁচিশ লম্বা বলে মনে হয়। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য বোঝার কোনও উপায় নেই। বোধ হয় ডুংলুং-ডোর দিক থেকেই একটা গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ায় ভেসে আসছে, সেটাকে প্রথমে কস্তুরী বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু এখন অন্যরকম লাগছে। সেটা কীসের গন্ধ বলা শক্ত, শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এমন খোসবু আমাদের কারুর নাকে এর আগে কখনও প্রবেশ করেনি।

আবার ঝোড়ো বাতাস আরম্ভ হল। এবার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকি।

২০শে আগস্ট, দুপুর দেড়টা

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, চারিদিক ঘোলাটে অন্ধকার, তারমধ্যে লক্ষ বাঁশির মতো শব্দ করে বরফের ঝড় বইছে। ভাগ্যিস গিয়ানিমার বাজার থেকে বিলিতি তাঁবুর বদলে তিব্বতি পশমের তাঁবু কিনে নিয়েছিলাম।

আজ সারাটা দিন এ ক্যাম্পেই থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

২০শে আগস্ট, বিকেল পাঁচটা

আমাদের তিব্বত অভিযানের একটা হাইলাইট বা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই কিছুক্ষণ আগে ঘটে গেল।

তিনটে নাগাদ ঝড়টা একটু কমলে পর রাবসাং আমাদের চারজনকে মাখন-চা দিয়ে গেল। বাইরে ঝড়ের শব্দ কমলেও দমকা বাতাসে আমাদের তাঁবুর কাপড় বার বার কেঁপে উঠছিল। অবিনাশবাবু তাঁর চায়ে চুমুক দিয়ে 'ভেরি গুড' কথাটা সবে উচ্চারণ করেছেন এমন সময় বাইরে, যেন বহুদূর থেকে, একটা চিৎকার শোনা গেল। পুরুষকণ্ঠে পরিত্রাহি চিৎকার। কথা বোঝার উপায় নেই, শুধু আর্তনাদের সুরটা বোঝা যাচ্ছে। আমরা চারজনে চায়ের পাত্র রেখে ব্যস্তভাবে তাঁবুর বাইরে এলাম।

'হেল্‌প, হেল্‌প... সেভ মি! হেল্‌প!...'

এবার বোঝা যাচ্ছে। কণ্ঠস্বরও চেনা যাচ্ছে। অ্যাদ্দিন মার্কোভিচ ইংরিজি বলেছে রাশিয়ান উচ্চারণে, এই প্রথম তার মুখে খাঁটি ইংরেজের উচ্চারণ শুনলাম। কিন্তু লোকটা কোথায়। রাবসাংও হতভম্বের মতো এদিকে ওদিকে চাইছে, কারণ চিৎকারটা একবার মনে হচ্ছে দক্ষিণ থেকে, একবার মনে হচ্ছে উত্তর থেকে আসছে।

হঠাৎ ক্রোল চেঁচিয়ে উঠল—'ওই তো!'

সে চেয়ে আছে উত্তরে নয়, দক্ষিণে নয়—একেবারে শূন্যে, আকাশের দিকে। মাথা তুলে স্তম্ভিত হয়ে দেখি মার্কোভিচ শূন্যে ভাসতে ভাসতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একবার সে নীচের দিকে নামে, পরক্ষণেই এক দমকা বাতাস তাকে আবার উপরে তুলে দেয়। এই

অবস্থাতেই সে ক্রমাগত হাত পা ছুড়ে চিৎকার করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

কীভাবে সে এই অবস্থায় পৌঁছাল সেটা ভাববার সময় নেই; কী করে তাকে নামানো যায় সেটাই সমস্যা। কারণ পাগলা হাওয়া যে শুধু থামছেই না তা নয়, ক্ষণে ক্ষণে তার বেগ ও গতিপথ বদলাচ্ছে।

'লেট হিম স্টে দেয়ার!' সন্ডার্স হঠাৎ বলে উঠল। ক্রোল সে কথায় তৎক্ষণাৎ সায় দিল। তারা বুঝেছে মার্কোভিচকে শাস্তি দেবার এটা চমৎকার পন্থা। এদিকে আমার বৈজ্ঞানিক মন বলছে মার্কোভিচ নীচে না নামলে তার ওড়ার কারণটা জানা যাবে না। রাবসাং কিন্তু ইতিমধ্যে তার তিব্বতি বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লেগে গেছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে খানদশেক লম্বা চমরির লোমের দড়ি পরস্পরের সঙ্গে গেরো বেঁধে তার এক মাথায় একটা পাথর বেঁধে সেটাকে মার্কোভিচের দিকে তাগ করে ছোড়ার জন্য তৈরি হল।

ক্রোল তাকে গিয়ে বাধা দিল। মার্কোভিচ এখন আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে। ক্রোল তার দিকে ফিরে কর্কশ গলায় চিৎকার করে বলল, 'ড্রপ দ্যাট গান ফার্স্ট'। অর্থাৎ, আগে তোমার হাত থেকে বন্দুকটা নীচে ফেলো। মার্কোভিচের হাতে বন্দুক রয়েছে সেটা এতক্ষণ দেখিনি।

মার্কোভিচ বাধ্য ছেলের মতো তার হাতের মান্‌লিখারটা ছেড়ে দিল, আর সেটা আমাদের থেকে দশ হাত দূরে মাটিতে পড়ে খানিকটা আলগা বরফ চারদিকে ছিটিয়ে দিল।

এবার রাবসাং দড়ির মাথায় বাঁধা পাথরটা মার্কোভিচের দিকে ছুড়ে দিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। মার্কোভিচ খপ করে সেটা লুফে নিল। তারপর রাবসাং একাই অনায়াসে তাকে টেনে মাটিতে নামিয়ে আনল।

এইবার লক্ষ করলাম যে, মৃত লামার ঘরে যে বাহারের বুটজুতো দেখেছিলাম, তারই একজোড়া রয়েছে মার্কোভিচের পায়ে। এ ছাড়া তার কাঁধের ঝোলার ভিতর থেকেও গুম্ফার অনেক জিনিস বেরোল, তার অধিকাংশই সোনার। ডাকাত হাতে হাতে ধরা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমনই একটা আশ্চর্য জিনিসের সন্ধান সে আমাদের দিয়েছে যে, তাকে শাস্তি বা ধমক দেওয়ার কথাটা আমাদের মনেই হল না।

মার্কোভিচ আমাদের ছেড়ে পালিয়েছিল ঠিকই, আর তার মতলব ছিল যাবার পথে মৃত লামার গুম্ফা থেকে বেশ কিছু মূল্যবান দ্রব্য সরিয়ে নেওয়া। মূর্তিটুর্তি ঝোলায় ভরার পর তার বুটের কথাটা মনে পড়ে। সেদিন থেকেই তার লোভ লেগেছিল ওই জিনিসটার ওপর। বুট নিয়ে বাইরে এসে সেটা পরে দু-এক পা হেঁটেই বুঝতে পারে নিজেকে বেশ হালকা লাগছে। এইভাবে টুণ্ডুপ সমেত দু-মাইল সে দিব্যি চলেছিল, এমন সময় এক উত্তরমুখী ঝড় এসে তার সমস্ত ফন্দি ভণ্ডুল করে দিয়ে তাকে আকাশে তুলে নিয়ে আবার আমাদেরই কাছে এনে হাজির করে।

ক্রোল ও সন্ডার্স স্বভাবতই এই কাহিনী শুনে একেবারে হতভম্ব। তখন আমি তাদের পুঁথি আর ংমুং-এর কথাটা বললাম। 'কিন্তু তার সঙ্গে এই বুটের সম্পর্ক কী?' প্রশ্ন করল সন্ডার্স। আমি বললাম, 'পুঁথিতে এই ংমুং-এর সঙ্গে মানুষের গুলফ বা গোড়ালির একটা সম্পর্কের কথা বলা আছে। আমার বিশ্বাস এই দুইয়ের সংযোগেই মানুষের দেহের ওজন কমে যায়। আমি জানি ওই বুটের সুকতলায় ংমুং-এর প্রলেপ লাগানো আছে।'

অন্য সময় হলে কী হত জানি না, চোখের সামনে মার্কোভিচকে উড়তে দেখে ক্রোল ও সন্ডার্স দুজনকেই আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হল। বলা বাহুল্য, এই তিব্বতি বুট আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে চাই। রাবসাংকে বলতে সে বলল, সে নিজেই গুম্ফা থেকে আমাদের

চারজনের জন্য চার জোড়া জুতো নিয়ে আসবে।

মার্কোভিচ এখন একেবারে সুবোধ বালকটি। তার কাছে চোরাই মাল যা ছিল সব আমরা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছি। সেগুলো ফেরার পথে সব যথাস্থানে রেখে দেওয়া হবে। মার্কোভিচ জানে যে, আমাদের কাছে তার মুখোশ খুলে গেছে। এরপর সে আর কোনও বাঁদরামি করবে বলে তো মনে হয় না। তবে 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন...' ইত্যাদি।

২১শে আগস্ট।

আমরা ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের সামনে ক্যাম্প ফেলে বসে আছি কাল বিকেল থেকে। খাড়াই উঠে গেছে প্রাচীর প্রায় দেড়শো ফুট! এটা যে কী দিয়ে তৈরি তা ভূতত্ত্ববিদ সন্ডার্স পর্যন্ত বলতে পারল না। কোনও চেনা পাথরের সঙ্গে এই গোলাপি পাথরের কোনও মিল নেই। এ পাথর আশ্চর্য রকম মসৃণ ও আশ্চর্য রকম মজবুত। ধাপে ধাপে গর্ত করে তাতে পা ফেলে ওপরে ওঠার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ক্রোল তিব্বতি বুট পরে দু-একবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হাওয়ার অভাবে বিশ-পঁচিশ ফুটের ওপরে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ প্রাচীরের পিছনে কী আছে জানবার একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে। সন্ডার্স বলছে এটা একটা দুর্গ জাতীয় কিছু। আমি এখনও বলছি হ্রদ।

অবিনাশবাবু আরও পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য তৈরি হয়ে আছেন। প্রাচীরের পিছন থেকে কোনওরকম শব্দ না পেলেও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল মনমাতানো গন্ধে চারিদিক মশগুল হয়ে আছে। আমরা তিন-তিনজন ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক এই গন্ধের কোনও কারণ খুঁজে না পেরে বোকা বনে আছি।

২২শে আগস্ট।

আশ্চর্য বুদ্ধি প্রয়োগ—অভাবনীয় তার ফল।

আমাদের সঙ্গে পুরনো খবরের কাগজ ছিল অনেক। সেইগুলোর সঙ্গে দুটো তিব্বতি ম্যাপ আর কিছু র‍্যাপিং পেপার জুড়ে, আমাদের স্টকের তার দিয়ে কাঠামো বানিয়ে, একেবারে খাঁটি দিশি উপায়ে একটা ফানুস তৈরি করে আগুন জ্বালিয়ে তাতে গ্যাস ভরলাম। তারপর সেটার সঙ্গে একটা দুশো ফুট লম্বা দড়ি বাঁধলাম। সেই দড়িতে আমার ক্যামেরা বেঁধে, পাঁচিলের দিকে তার মুখ ঘুরিয়ে পনেরো সেকেন্ড পরে আপনি ছবি উঠবে এরকম একটা ব্যবস্থা করে ফানুস ছেড়ে দিলাম। দড়ি-ক্যামেরা সমেত সাঁই সাঁই করে ফানুস উপরের দিকে উঠে গেল। প্রাচীরের মাথা ছাড়িয়ে যেতে লাগল ছ'সেকেন্ড। তারপর আর দড়ি ছুড়লাম না। বিশ সেকেন্ড পরে ফানুস সমেত ক্যামেরা নামিয়ে আনলাম।

ছবি উঠেছে। রঙিন ছবি। হ্রদের ছবি নয়। দুর্গেরও ছবি নয়। গাছপালা লতাগুল্মে ভরা এক অবিশ্বাস্য সুন্দর সবুজ জগতের ছবি। এরই নাম ডুংলুং-ডো।

আপাতত আমরা প্রাচীর থেকে প্রায় বারোশো গজ দূরে একটা পাথরের ঢিবির পাশে বসে আছি। আমাদের পাঁচজনেরই পায়ে তিব্বতি বুট। আমরা অপেক্ষা করছি ঝড়ের জন্য। আশা আছে, সেই ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের ওপারের রাজ্যে গিয়ে ফেলবে। তারপর কী আছে কপালে জানি না।

৫

৩০শে আগস্ট।

দূরে—বহু দূরে—একটা দল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এটা যদি দস্যুদল হয় তা হলে আমাদের আর কোনও আশা নেই। ডুংলুং-ডোর আবহাওয়ায় পাঁচদিনে আমাদের যে স্বাস্থ্যোন্নোতি হয়েছিল তার জোরেই আমরা এই দশ মাইল পথ হেঁটে আসতে পেরেছি। কিন্তু এখন শক্তি কমে আসছে। আমরা যেদিকে যাচ্ছি হাওয়া বইছে তার উলটো দিকে; তাই তিব্বতি বুটগুলোও কোনও কাজে আসছে না। খাবারদাবারও ফুরিয়ে আসছে, বড়িও বেশি নেই। এ অবস্থায় পিস্তল বন্দুক সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও, একটা বড় দস্যুদল এসে পড়লে আমাদের চরম বিপদে পড়তে হবে। এমনিতেই আমরা একজনকে হারিয়েছি। অবিশ্যি তার মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী। তার অতিরিক্ত লোভই তাকে শেষ করেছে।

অবিনাশবাবুর ধারণা, যে দলটা এগিয়ে আসছে সেটা যাযাবরের দল। বললেন, 'আপনার যন্ত্রে কী দেখলেন জানি না মশাই। ওরা দস্যু হতেই পারে না। কৈলাস, মানস সরোবর ও ডুডুংলা দেখার ফলে আমি দিব্যদৃষ্টি পেয়েছি। আমি স্পষ্ট দেখছি ও দল আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারে না।'

যাযাবরের দল হলে অনিষ্ট করার কথা নয়। বরং তাদের কাছ থেকে ঘোড়া, চমরি, খাবারদাবার ইত্যাদি সব কিছুই পাওয়া যাবে। তার ফলে আমরা যে নিরাপদে দেশে ফিরে যেতে পারব সে ভরসাও আছে আমার।

সাঁইত্রিশ ঘণ্টা ঝড়ের অপেক্ষায় বসে থেকে তেইশ তারিখ দুপুরে দেড়টা নাগাদ আকাশের অবস্থা ও তার সঙ্গে একটা শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম আমরা যে রকম ঝড় চাই—অর্থাৎ যার গতি হবে উত্তর-পশ্চিম—সে রকম একটা ঝড় আসছে। অবিনাশবাবুর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, তাঁকে ঠেলে তুলে দিলাম। তারপর আমরা পাঁচজন বুটধারী ঝড়ের দিকে পিঠ করে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের দিকে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালাম। তিন মিনিট পরে ঝড়টা এসে আমাদের আঘাত করল। আমার ওজন এমনিতেই সবচেয়ে কম—এক মণ তেরো সের—কাজেই সবচেয়ে আগে আমিই শূন্যে উঠে পড়লাম।

এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঝড়ের দাপটে সাঁই সাঁই করে এগিয়ে চলেছি শূন্যপথ দিয়ে, আর ক্রমেই উপরে উঠছি। সেই সঙ্গে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরও আমার দিকে এগিয়ে আসছে আর নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সামনের দৃশ্য দ্রুত বদলে যাচ্ছে, কারণ প্রাচীর আর আমাদের দৃষ্টিপথে বাধার সৃষ্টি করছে না। প্রথমে পিছনে বহু দূরে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চুড়ো দেখা গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে প্রাচীর যে আশ্চর্য জগৎটাকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল, সেই সবুজ জগৎ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রাচীরের বাধা অতিক্রম করে আমরা সেই জগতে প্রবেশ করতে চলেছি। আমার পিছন দিকে ক্রোল, সন্ডার্স ও মার্কোভিচ ইংরিজি ও জার্মান ভাষায় ছেলেমানুষের মতো উল্লাস প্রকাশ করছে, আর অবিনাশবাবু বলছেন, 'ও মশাই—এ যে নন্দন কানন মশাই—এ যে দেখছি নন্দন কানন!'

প্রাচীর পেরোতেই ঝড়ের তেজ ম্যাজিকের মতো কমে গেল। আমরা পাঁচজন বাতাসে ভেসে ঠিক পাখির পালকের মতোই দুলতে দুলতে ঘাসে এসে নামলাম। সবুজ রং, তাই ঘাস বললাম, কিন্তু এমন ঘাস কখনও চোখে দেখিনি। সন্ডার্স চেঁচিয়ে উঠল—'জানো শঙ্কু—এখানের একটি গাছও আমার চেনা নয়, একটিও নয়! এ একেবারে আশ্চর্য নতুন প্রাকৃতিক

পরিবেশ!'

কথাটা বলেই সে পাগলের মতো ঘাস পাতা ফুলের নমুনা সংগ্রহ করতে লেগে গেল। ক্রোল তার ক্যামেরা বার করে পটাপট ছবি তুলছে। অবিনাশবাবু ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিয়ে বললেন, 'এইখানেই থেকে যাই মশাই। আর গিরিডি গিয়ে কাজ নেই। এ অতি উর্বর জমি। চাষ হবে এখানে। চাল ডাল সবজি সব হবে।' মার্কোভিচ তার বুট খুলে লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে জায়গাটা অনুসন্ধান করতে এগিয়ে গেল।

ডুংলুং-ডো আয়তনে প্রায় মানস সরোবরের মতোই বড়। বৃত্তাকার প্রাচীরের মধ্যে একটা অগভীর বাটির মতো জায়গা। দেখে মনে হয় কেউ যেন হাত দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীরের বাইরেটা নীচের দিকে খাড়া নেমে গেলেও ভিতরটা ঢালু হয়ে নেমেছে। সন্ডার্স ঠিকই বলেছে। এখানে একটা গাছও আমাদের চেনা নয়। তারও নয়, আমারও নয়, তবে প্রতিটি গাছই ডালপালা ফুলপাতা মিলিয়ে ছবির মতো সুন্দর।

আমরা চারজন বুট পরে লাফিয়ে লাফিয়ে অর্ধেক হেঁটে অর্ধেক উড়ে জায়গাটার ভিতর দিকে এগোচ্ছি এমন সময় হঠাৎ একটা শনশন শব্দ পেলাম। তারপর সামনের একটা বড় বড় পাতাওয়ালা গাছের মাথার উপর দিয়ে দূরে আকাশে প্রকাণ্ড একটা কী যেন দেখা গেল। সেটা ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বুঝতে পারলাম সেটা একটা পাখি। শুধু পাখি নয়—একটা অতিকায় পাখি। পাঁচশো ঈগল এক করলে যা হয় তেমন তার আয়তন।

'মাইন গট্!' বলে এক অস্ফুট চিৎকার করে ক্রোল তার মান্‌লিখারটা পাখির দিকে উঁচোতেই আমি হাত দিয়ে সেটার নলটা নীচের দিকে নামিয়ে দিলাম। শুধু যে বন্দুকে ও পাখির কোনও ক্ষতি করা সম্ভব হবে না তা নয়, আমার মন বলছে পাখি আমাদের কোনও অনিষ্ট করবে না।

ঈগলের মুখ ও সাউথ আমেরিকান ম্যাকাওয়ের মতো ঝলমলে রঙের পালকওয়ালা অতি-বিশাল পাখিটা মাথার উপর তিনবার চক্রাকারে ঘুরে সমুদ্রগামী জাহাজের ভোঁয়ের মতো শব্দ করতে করতে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল। আমার মুখ দিয়ে আপনা থেকেই একটা কথা বেরিয়ে পড়ল—'রক্!'

'হোয়াট?' ক্রোল বন্দুক হাতে নিয়ে বোকার মতো প্রশ্ন করল।

আমি আবার বললাম—'রক্! অথবা রুখ্। সিন্ধবাদের গল্পে এইরকমই একটা পাখির কথা ছিল।'

ক্রোল বলল, 'কিন্তু আমরা তো আর অ্যারেবিয়ান নাইটস্-এর রাজ্যে নেই। এ তো একেবারে বাস্তব জগৎ। পায়ের তলায় মাটি রয়েছে, হাত দিয়ে গাছের পাতা ধরছি, নাকে ফুলের গন্ধ পাচ্ছি...'

সন্ডার্স তার বিস্ময় কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'জঙ্গলের মধ্যে একটিও পোকামাকড় দেখছি না, সেটা খুবই আশ্চর্য লাগছে আমার।'

আমরা চারজন এগোতে এগোতে হঠাৎ একটা বাধা পেলাম। এই প্রথম উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কিছুর সামনে পড়তে হল। প্রায় দু'মানুষের সমান উঁচু একটা নীল ও সবুজে মেশানো পাথুরে ঢিবি আমাদের সামনে পড়েছে। সেটা দুপাশে কতদূর পর্যন্ত গেছে জানি না। হয়তো ডাইনে বাঁয়ে কাছাকাছির মধ্যেই তার শেষ পাওয়া যাবে, কিন্তু ক্রোল আর ধৈর্য রাখতে পারল না। সে তার বুট সমেত একটা বিরাট লাফ দিয়ে অনায়াসে উড়ে গিয়ে ঢিবিটার মাথার উপর পড়ল। আর তারপরেই এক কাণ্ড। ঢিবিটা নড়ে উঠল। তারপর সেটা সবসুদ্ধ বাঁ দিকে চলতে আরম্ভ করল। ক্রোলও তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, এমন সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—'মাইন গট!—

ইট্‌স এ ড্র্যাগন!'

ড্র্যাগনই বটে। ক্রোল ভুল বলেনি। সেই ড্র্যাগনের একটা বিশাল পিছনের পা এখন আমাদের সামনে দিয়ে চলেছে। অবিনাশবাবু 'ওরে বাবা' বলে ঘাসের উপর বসে পড়লেন। ইতিমধ্যে ক্রোলও ড্র্যাগনের পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে আমাদের কাছে চলে এসেছে। আমরা অবাক হয়ে এই মন্থরগতি দানবতুল্য জীবের যেটুকু অংশ দেখতে পাচ্ছি তার দিকে চেয়ে রইলাম। প্রায় তিন মিনিট সময় লাগল ড্র্যাগনটার আমাদের সামনে দিয়ে লেজটা এঁকিয়ে বেঁকিয়ে গাছপালার পিছনে অদৃশ্য হয়ে যেতে। যে ধোঁয়াটা এখন বনের বেশ খানিকটা অংশ ছেয়ে ফেলেছে সেটা ওই ড্র্যাগনের নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এতক্ষণে ক্রোলের বোধ হয় আমার কথায় বিশ্বাস হয়েছে। তার অদ্ভুত নিরীহ ভ্যাবাচাকা ভাব থেকে তাই মনে হয়। সন্ডার্স বলল, 'চারিদিকের এই সম্পূর্ণ অপরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে নিজেকে একেবারে অশিক্ষিত বর্বর বলে মনে হচ্ছে, শঙ্কু!'

আমি বললাম, 'আমার কিন্তু ভালই লাগছে। আমাদের এই গ্রহে যে জ্ঞানী মানুষের বিস্ময় জাগানোর মতো কিছু জিনিস এখনও রয়েছে, এটা আমার কাছে একটা বড় আবিষ্কার।'

আরও ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়িয়ে বিস্ময় জাগানোর মতো কত প্রাণী যে দেখলাম তার হিসেব নেই। একটা ফিনিক্সকে আগুনে পোড়ার ঠিক আগের মুহূর্ত থেকে, তার জায়গায় নতুন ফিনিক্সকে জন্মে পাখা মেলে সূর্যের দিকে উড়ে যেতে দেখেছি। এ ছাড়া উপকথার পাখির মধ্যে গ্রিফন দেখেছি; পারস্যের সিমুর্ঘ, আরবদের আঙ্কা দেখেছি; রুশদের নোর্ক আর জাপানিদের ফেং ও কির্নে দেখেছি। সরীসৃপের মধ্যে চোখের চাহনিতে ভস্ম করা ব্যাসিলিস্ক দেখেছি। একটা আগুনে অদাহ্য স্যালিম্যান্ডারকে দেখলাম তার বিশেষত্ব জাহির করার জন্যই যেন বার বার একটা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করছে, আর অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসছে। একটা প্রকাণ্ড চতুর্দন্ত শ্বেতহস্তী দেখেছি, সেটা ইন্দ্রের ঐরাবত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আর সেটা যে গাছের ডালপালা ছিঁড়ে খাচ্ছিল, তার পত্রপুষ্পের চোখ ঝলসানো বর্ণচ্ছটা দেখে সেটা যে স্বর্গের পারিজাত, তা অবিনাশবাবুও সহজেই অনুমান করলেন।

তবে জায়গাটা যে সর্বত্রই বৃক্ষলতাগুল্মশোভিত নন্দন কানন, তা নয়।

উত্তরের প্রাচীর ধরে মাইলখানেক যাবার পর হঠাৎ দেখি, গাছপালা ফুলফল সব ফুরিয়ে গিয়ে ধুসর রুক্ষ এক পাথরের রাজ্যে হাজির হয়েছি। সামনে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ নিয়ে এক পাহাড়, তার গায়ে একটা গুহা, আর সে গুহার ভিতর থেকে রক্ত হিম করা বিচিত্র সব হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে।

বুঝতে পারলাম আমরা রাক্ষসের রাজ্যের প্রবেশপথে এসে পড়েছি। রাক্ষস সব দেশেরই উপকথাতে আছে, আর তাদের বর্ণনাও মোটামুটি একই রকম। সন্ডার্স গুহায় প্রবেশ করতে মোটেই রাজি নয়। ক্রোলের দোনামনা ভাব। এটা দেখেছি যে এখানকার প্রাণীরা আমাদের গ্রাহ্যই করে না; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ইতস্তত করছি, কারণ অবিনাশবাবু আমার কোটের আস্তিন ধরে চাপ মেরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—ঢের হয়েছে, এবার চলুন ফিরি—এমন সময় একটা তারস্বরে চিৎকার শুনে আমাদের সকলেরই মনটা সেইদিকে চলে গেল।

'ইউনিকর্নস! ইউনিকর্নস! ইউনিকর্নস!'

বাঁ দিকে একটা মস্ত ঝোপের পিছন থেকে মার্কোভিচের গলায় চিৎকারটা আসছে।

'ও কি আবার কোকেন খেল নাকি?' ক্রোল প্রশ্ন করল।

'মোটেই না' বলে আমি এগিয়ে গেলাম ঝোপটার দিকে। সেটা পেরোতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল।

ছোট বড় মাঝারি নানান সাইজের একটা জানোয়ারের পাল আমাদের সামনে দিয়ে

চলেছে। তাদের গায়ের রং গোলাপি আর খয়েরি মেশানো। গোরু আর ঘোড়া—এই দুটো প্রাণীর সঙ্গেই তাদের চেহারার মিল রয়েছে, আর রয়েছে প্রত্যেকটার কপালে একটা করে প্যাঁচানো শিং। বুঝতে পারলাম যে, এদের সন্ধানেই আমাদের অভিযান। এরাই হল একশৃঙ্গ বা ইউনিকর্ন। প্লিনির ইউনিকর্ন, বিদেশের রূপকথার ইউনিকর্ন, মহেঞ্জোদাড়োর সিলে খোদাই করা ইউনিকর্ন।

জানোয়ারগুলোর সব কটাই যে হাঁটছে তা নয়। তাদের মধ্যে কয়েকটা ঘাস খাচ্ছে, কয়েকটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লাফিয়ে চাঞ্চল্য প্রকাশ করছে, আবার কয়েকটা বাচ্চা ইউনিকর্ন খেলাচ্ছলে পরস্পরকে গুঁতোচ্ছে। মনে পড়ল উইলার্ডের ডায়রিতে লেখা 'আই স এ হার্ড অফ ইউনিকর্ন টুডে।' আমরাও উইলার্ডের মতো সুস্থ মস্তিষ্কেই দলটাকে দেখছি।

কিন্তু মার্কোভিচ কই?

সবে প্রশ্নটা মাথায় এসেছে এমন সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য। জানোয়ারের মধ্যে থেকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে মার্কোভিচ—তার লক্ষ্য হল আমাদের পিছনে ঘাসের শেষে ডুংলুং-ডোর প্রাচীরের দিকে। আর সে যাচ্ছে একা নয়—তার দুহাতে জাপটে ধরা রয়েছে একটা গোলাপি রঙের ইউনিকর্নের বাচ্চা।

সন্ডার্স চেঁচিয়ে উঠল—'থামাও, শয়তানকে থামাও!'

'বুট পরো, বুট পরো!'—চিৎকার করে উঠল ক্রোল। সে ছুটেছে মার্কোভিচকে লক্ষ্য করে। আমরাও তার পিছু নিলাম।

কথাটা ঠিক সময়ে কানে গেলে হয়তো মার্কোভিচের খেয়াল হত। কিন্তু তা আর হল না। ঘাসের জমি ছাড়িয়ে প্রাচীরের মাথায় পৌঁছিয়েই সে এক মরিয়া, বেপরোয়া লাফ দিল! অবাক হয়ে দেখলাম যে লাফটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কোল থেকে ইউনিকর্নের বাচ্চাটা উধাও হয়ে গেল, আর পরমুহূর্তেই মার্কোভিচের নিম্নগামী দেহ প্রাচীরের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরে রাবসাং-এর সঙ্গে কথা হয়েছিল। সে মার্কোভিচকে প্রাচীরের উপর থেকে দেড়শো ফুট নীচে মাটিতে পড়তে দেখে তার দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু তার আর কিছু করবার ছিল না।

হাড়গোড় ভেঙে মার্কোভিচের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। ইউনিকর্নের কথা জিজ্ঞেস করাতে সে অবাক হয়ে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'সাহেব একাই পড়েছিলেন। তাঁর হাতে কিচ্ছু ছিল না!'

ডুংলুং-ডো সম্পর্কে আমি যে ধারণাটায় পৌঁছেছি সন্ডার্স ও ক্রোল তাতে সায় দিয়েছে। আমার মতো অনেক দেশের অনেক লোক অনেক কাল ধরে যদি এমন একটা জিনিস বিশ্বাস করে যেটা আসলে কাল্পনিক, তা হলে সেই বিশ্বাসের জোরেই একদিন সে কল্পনা বাস্তব রূপ নিতে পারে। এইভাবে বাস্তব রূপ পাওয়া কল্পনার জগৎ হল ডুংলুং-ডো। হয়তো এমন জগৎ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ডুংলুং-ডো-র কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদকে তার গণ্ডির বাইরে আনা মানেই তাকে আবার কল্পনার জগতে ফিরিয়ে আনা। মার্কোভিচ তাই ইউনিকর্ন আনতে পারেনি, সন্ডার্সের থলি থেকে তার সংগ্রহ করা ফুলপাতা তাই উধাও হয়ে গেছে।

মৌনী লামার একসঙ্গে হ্যাঁ-না বলার মানেও এখন স্পষ্ট। একশৃঙ্গ সত্যিই থেকেও নেই। অবিশ্যি ওড়ার ব্যাপারে উনি 'না' বলে ভুল করেছিলেন, তার কারণ উড্ডয়নসূত্রে-র কথাটা উনি বোধ হয় জানতেন না।

অবিনাশবাবু সব শুনেটুনে বললেন, 'তার মানে বলছেন দেশে ফিরে গিয়ে দেখাবার কিছু নেই—এই তো?'

আমি বললাম, 'ক্রোলের তোলা ছবি আছে। অবিশ্যি সাধারণ লোকের কাছে সেটা খুব বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে হয় না। আর আছে আমাদের তিব্বতি বুটজুতো। কিন্তু পুঁথিতে বলছে ংমুং জিনিসটা গরমে গলে গিয়ে তার গুণ চলে যায়।'

অবিনাশবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবার আমি আমার মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লাম।

'আমরা যে প্রায় পঁচিশ বছর বয়স কমিয়ে দেশে ফিরছি সেটা বোধ হয় খেয়াল করেননি।'

'কী রকম?'

আমি আমার দাড়ি গোঁফ থেকে বালি আর বরফের কুচি ঝেড়ে ফেলে দিতেই অবিনাশবাবুর চোখ গোল হয়ে গেল।

'এ কী, এ যে কালো কুচকুচে কাঁচা!'

আমি বললাম, 'আপনার গোঁফও তাই। আয়নায় দেখুন।'

অবিনাশবাবু আয়না নিয়ে অবাক বিস্ময়ে নিজের গোঁফের দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় সন্ডার্স এল। সন্ডার্সেরও বয়স কমে গেছে, তার উপরের পাটির পিছন দিকের একটা দাঁত নড়ছিল, সেটা আবার শক্ত হয়ে গেছে। সে একটা গভীর নিশ্চিন্তির হাঁপ ছেড়ে বলল—

'নিম্যাড্স, নট রবারস্—থ্যাঙ্ক গড!'

বাইরে থেকে যাযাবরদের হইহল্লার শব্দ, ঘোড়ার খুরের শব্দ, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনতে পাচ্ছি। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। ওঁ মণিপদ্মে হুম্।

সন্দেশ। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৮০

priyobanglaboi.blogspot.com